অঙ্গীকার

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস
৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০

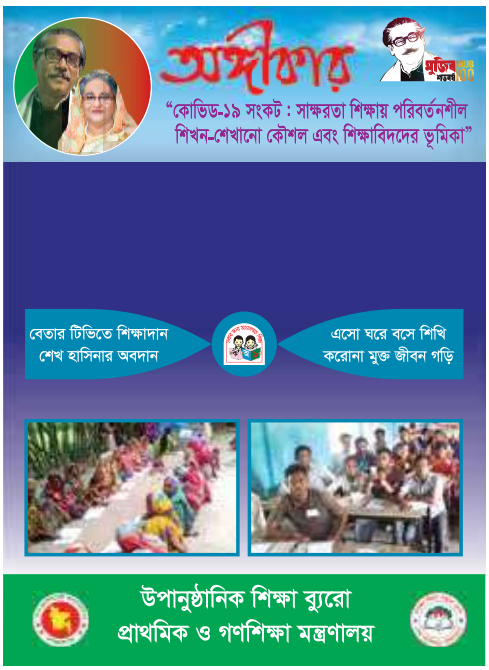

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

অঙ্গীকার
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২০

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

পৃষ্ঠপোষক : জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব তপন কুমার ঘোষ
মহাপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সম্পাদনা পরিষদ

আহবায়ক : জনাব আলম আরা বেগম
অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

সদস্য : জনাব শামস আল মুজাদ্দিদ, পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
জনাব মোহাম্মদ মিকাইল, মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব সত্যকাম সেন, উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব ডাঃ ফারজানা আরজুমান্দ, উপসচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব মুর্শিদা বেগম, সিস্টেম এনালিস্ট, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন, উপপরিচালক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
জনাব মোহাম্মদ রুকুনুদ্দীন সরকার, উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
জনাব মোঃ রিপন কবীর লস্কর, উপ-পরিচালক (প্রশা. ও অর্থ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
জনাব রবীন্দ্রনাথ রায়, জনসংযোগ কর্মকর্তা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
জনাব খোদেজা আক্তার, লাইব্রেরিয়ান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ ১। জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন, উপ-পরিচালক, উপানুষ্ঠানিক ব্যুরো
২। জনাব মোহাম্মদ খালেদ, সহকারী পরিচালক (অর্থ-লজিস্টিক) উপানুষ্ঠানিক ব্যুরো
৩। জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, স্টোর অফিসার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

প্রকাশনায় : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ : অনার্য পাবলিকেশন্স লি.
anarjo5271@gmail.com

যোগাযোগ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
২৩২/১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮
ফোন: ০২-৯৮৮৭৮৯৫, ই-মেইল: dg@bnfe.gov.bd,
ওয়েব: www.bnfe.gov.bd

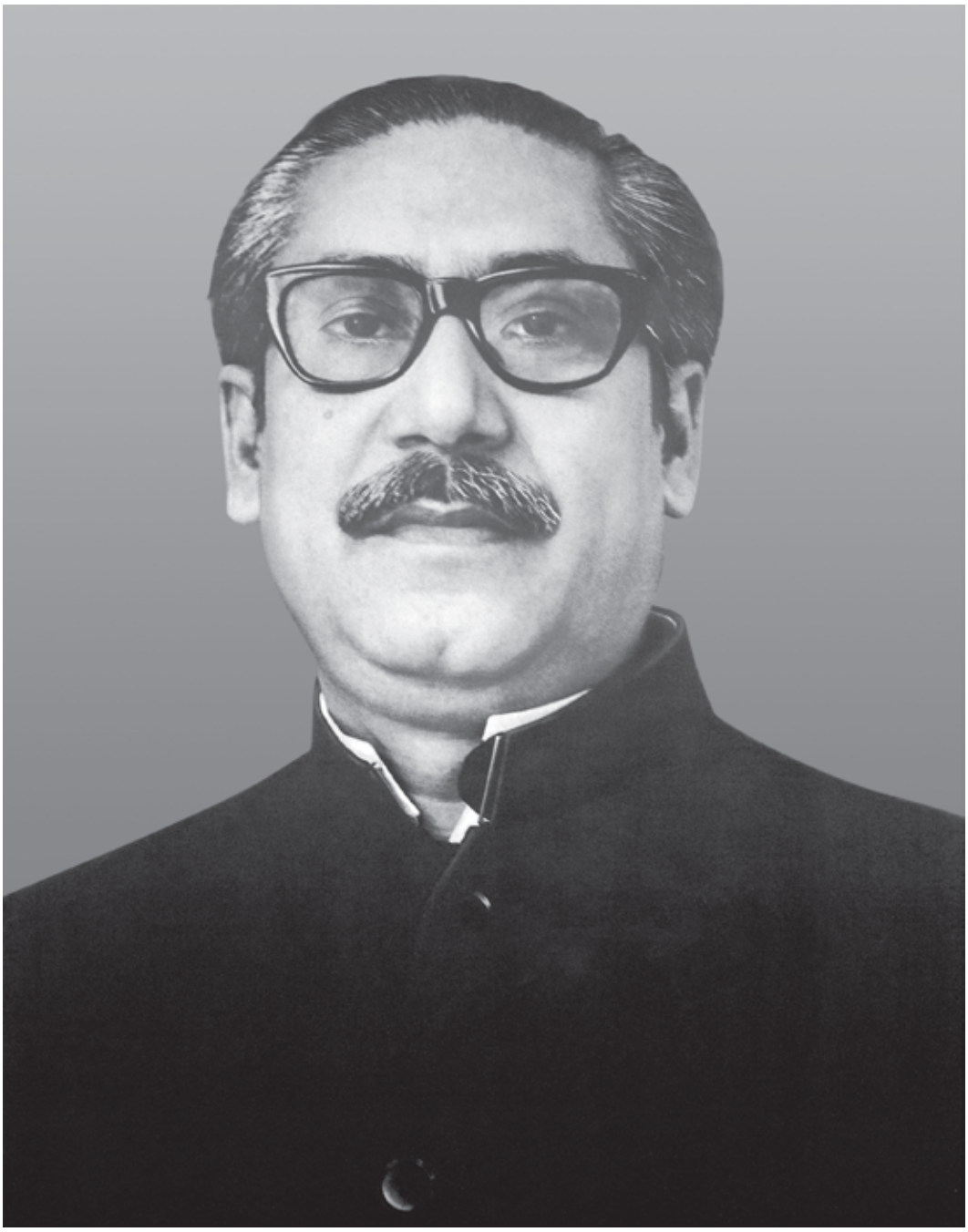

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৪ ভাদ্র ১৪২৭
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies' অর্থাৎ 'কোভিড-১৯ সংকটঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা' চলমান প্রেক্ষাপটে যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম মানবসম্পদে পরিণত করতে সরকার বদ্ধপরিকর। সে লক্ষ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, শতভাগ উপবৃত্তি বিতরণ, স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমান বৈশ্বিক মহামারীতে শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যক্রমের ঘাটতি পুষিয়ে নিতে ইতোমধ্যে কোমলমতি শিশুদের জন্য একযোগে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে 'ঘরে বসে শিখি' শিখন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু-কিশোরদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান, নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদান, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলমান সাক্ষরতা কর্মসূচি একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। দেশের বিশাল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে যথাযথ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে বাংলাদেশকে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমি সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৪ ভাদ্র ১৪২৭
৮ সেপ্টেম্বর ২০২০

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও "আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য "Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies" তথা "কোভিড-১৯ সংকটঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়। স্বাধীনতার পর পরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধানের ১৭(গ) অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করে। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সে অঙ্গীকার পূরণে দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারায় নিয়ে আসার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আমাদের নিরলস ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে গত ১০ বছরে সাক্ষরতার হার ২৮.৯২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৭৪.৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সংক্রান্ত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে দেশকে আমরা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে চাই। এছাড়াও জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৪ (এসডিজি-৪) অনুযায়ী মানসম্মত ও সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার নানামুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে কোভিড-১৯ এর মহামারীর পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখতে সরকার অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। বিভিন্ন স্তরের স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের ক্লাশসমূহ অনলাইনে নেয়ার জন্য ইতোমধ্যেই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে নিয়মিত পাঠদান করা হচ্ছে।

সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মোঃ জাকির হোসেন এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৪ ভাদ্র-১৪২৭
৮ সেপ্টেম্বর-২০২০

বাণী

বিশ্ব মহামারি করোনা ভাইরাসের মধ্যেও এ বছর বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' উদযাপিত হতে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হয়। এ বছর কোভিড-১৯ কে বিবেচনায় নিয়ে সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য "Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies" নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি সংবিধানে অর্ন্তভূক্ত করেন। সে আলোকেই তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়েসমূহে স্বাভাবিক পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে বন্ধ থাকলেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে টেলিভিশন, বেতার ও অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষা-কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আমি আশাকরি করোনাভাইরাসের কারণে প্রাথমিক শিক্ষাখাতে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা আমরা অচিরেই পুষিয়ে নিতে পারবো। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরজ্ঞান প্রদান করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে ২১ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কোভিড-১৯ বিশ্ব পরিস্থিতি সত্ত্বেও ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়ন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মো: জাকির হোসেন, এমপি)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
Bangladesh Parliament

মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি
(১০ দিনাজপুর-৫)
সভাপতি
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
ও
সদস্য, বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
সদস্য, সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' উদযাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ বছর সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies" তথা "কোভিড-১৯ সংকটঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা" নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদ এর মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা মৌলিক অধিকার প্রদান করায় সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ (Sample Vital Statistics 2019) তথ্য অনুযায়ী এখনো ২৫.৩% লোক নিরক্ষর। তাই সবার আগে প্রয়োজন তাদেরকে সাক্ষরজ্ঞানদান করা। সে লক্ষ্যে ১৫ এবং তদুর্ধ্ব বয়সী নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পে'র আওতায় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আমি আশা করবো- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প" বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাক্ষরতার জন্য যে তিনটি মৌলিক বিষয় রয়েছে যেমন- ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোট বাক্য পড়তে পারা; নিজের ভাষায় সহজ ও ছোট বাক্য লিখতে পারা; দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিক হিসেব-নিকেশ করতে পারা; সেদিকটি লক্ষ্য রাখবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীতে অর্থাৎ মুজিব বর্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক ২১ (একুশ) লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদান করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সে মহতী উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। নিরক্ষতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা ও সমর্থনই এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুফল এনে দিতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত অর্জিত জ্ঞানই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ পথকে প্রশস্ত করবে। জাতির জনকের সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত অঙ্গীকারের আলোকে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় আরো নিরলসভাবে কাজ করবে এই প্রত্যাশা করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোস্তাফিজুর রহমান, এমপি)

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন
সিনিয়র সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২৪ ভাদ্র-১৪২৭
৮ সেপ্টেম্বর-২০২০

বাণী

৮ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' পালিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য হলো: **'Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies'** অর্থাৎ **'কোভিড-১৯ সংকটঃ সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা'**।

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় অব্যাহতভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে দেশব্যাপী মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫-৪৫ বছর বয়সি ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদান করা হচ্ছে। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থায় ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও, কমিউনিটি লার্নিং সুবিধা ব্যবহার করে নিরক্ষরদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

কোভিড-১৯ সংকটে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। এ সংকটকালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে 'ঘরে বসে শিখি' শিখন প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। কিন্তু বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের বর্তমান পদ্ধতি বিবেচনায় রিমোট প্লাটফরমে সাক্ষরতা শিক্ষা কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে চালু করা যায়নি। এরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সাক্ষরতা শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য যথাযথ শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণের ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। সেজন্য দেশের সকল শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সক্রিয় সহযোগিতার আহবান আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০-এর মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে উঠে এসেছে।

'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০' উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

মোঃ আকরাম-আল-হোসেন

মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

২৪ ভাদ্র-১৪২৭
৮ সেপ্টেম্বর-২০২০

শুভেচ্ছা বক্তব্য

"Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies" তথা "কোভিড-১৯ সংকট : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা"-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজনের মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশেও ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায় থেকে তৃণমূল পর্যন্ত ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রতিবারের ন্যায় এবারও "অঙ্গীকার' নামক স্মরণিকা প্রকাশ করতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের মূল্যবান বাণী স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, দেশের স্বনামধন্য লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের সদস্য, সিভিল সোসাইটি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দের রচিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এ স্মরণিকাটিকে তথ্যবহুল ও মানসম্মত করেছে। এছাড়া, এসডিজি-৪ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনসহ জীবীকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি সন্নিবেশ করে যারা এ স্মরণিকাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদেরকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও দিকনির্দেশনা এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়সহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের সার্বিক সহযোগিতায় এ স্মরণিকাটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্মরণিকা প্রকাশের মতো এরূপ সৃজনশীল, শ্রমলব্ধ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য সম্পাদনা কমিটির সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

তপন কুমার ঘোষ

UNESCO Dhaka Office

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Message

Since 1967, every year, International Literacy Day celebrations take place around the world on the 8th of September to celebrate achievements towards a more literate and sustainable society, as well as an opportunity to remind the public of the importance of literacy for individuals, communities and societies, and the need for intensified efforts towards more literate societies.

This year's International Literacy Day (ILD) focuses on literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies. It provides an opportunity to look at and examine the position of educators and to evaluate effective strategies, processes, mechanisms and initiatives that promote literacy educators and literacy education.

The recent COVID-19 crisis has affected youth and adult literacy education around the world. A number of youth and adult literacy programmes that achieved great impact before the COVID-19 crisis, have since been suspended.

To avoid that non-literate youth and adults continue to be hardest hit by educational, social and economic impacts and ramifications of the COVID-19 pandemic, this year's International Literacy Day is a timely opportunity to explore alternative approaches and pedagogies to literacy teaching and learning, including ICT-enabled distance learning approaches and solutions.

The Government of Bangladesh is taking concrete and effective actions to ensure that literacy education and learning continues while schools and other learning centers have to remain closed due to COVID-19. In support of distance learning solutions developed and deployed by the Government, UNESCO in Bangladesh is assisting the Ministry of Education (MoE) and the Ministry of Primary and Mass Education (MoPME) in advancing literacy and non-formal education through distance learning solutions.

Currently, UNESCO supports the Directorate of Primary Education of MoPME in the development and dissemination of audio-based learning contents for primary school-aged children through the public and community radio. In parallel, the UNESCO Institute for Statistic is working with the MoE and the MoPME on a recently commenced study on out-of-school children focusing on the impact of COVID-19 in Bangladesh.

UNESCO is grateful to the Government of Bangladesh as well as all policy-makers, practitioners, and development partners who are dedicatedly working together hand-in-hand during this difficult period of time in order to support effective literacy teaching and learning across Bangladesh.

Beatrice Kaldun
Head of Office and
UNESCO Representative to Bangladesh

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২০: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ● তপন কুমার ঘোষ — ১৭
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিখন কৌশল ও শিক্ষাবিদগণের ভূমিকা ● আলম আরা বেগম — ২২
করোনা মহামারি এবং বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে করণীয় ● মোঃ শাহ আলম — ২৪
বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কোভিড-এর প্রভাব ● শামস আল মুজাদ্দিদ — ২৮
করোনাকালীন সাক্ষরতা ও কিছু কথা ● বাহালুল মজনুন চুন্নু — ৩১
বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশে সাক্ষরতা শিক্ষা ● প্রফেসর ড. অরুণ কুমার গোস্বামী — ৩৪
মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১ম সংশোধিত: উদ্দেশ্য ও অর্জন ● শামীমুল হক পাভেল — ৩৭
কোভিড-১৯ সংকটে বাংলাদেশে সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা ● মোঃ আবু তালেব মিয়া — ৪৫
করোনাকাল সময়ে সাক্ষরতা শিক্ষা ● মুর্শিদা বেগম — ৪৯
সাক্ষরতা, উন্নয়ন ও কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলা ● মোঃ মোশাররফ হোসেন — ৫৩
আমাদের শিশুরা ফিরবে কবে? ● ড. শোয়াইব জিবরান — ৫৫
স্কুল চলাকালীন সময়ে কোভিড প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য নির্দেশিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ● ড. জিয়া-উস-সবুর — ৫৮
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : কোভিড-১৯ সংকট ● ড. মোছাঃ ফাহমিদা বেগম — ৬৩
কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতায় এর প্রভাব ও সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় ● দিলীপ কুমার সরকার — ৬৫
কোভিড-১৯ সংকট সমস্যা ও পারিবারিক সাক্ষরতার প্রয়োগ ● সরোজ কুমার দাস — ৬৯
কোভিড সংকট : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া ও শিক্ষাকর্মীদের ভুমিকা ● তপন কুমার দাশ — ৭৫
করোনা পরবর্তী বিশ্ব মানবজাতিকে নতুন জীবনধারা ও নতুন সাক্ষরতার বার্তা দিচ্ছে ● মাছুম বিল্লাহ — ৭৯
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় আহ্ছানিয়া মিশনের করোনাকালীন নানা পদ্ধতির শিক্ষা কর্মসূচি ● শেখ শফিকুর রহমান — ৮২
একাল সেকাল মুক্তির শিক্ষায় করোনা কাল ● এএইচএম নোমান — ৮৭
কাভিড ১৯ : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়নে ইউসেপ বাংলাদেশ ● কুমার প্রীতীশ বল — ৯১
ফটো গ্যালারী — ৯৫

‘কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা’

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

তপন কুমার ঘোষ

ভূমিকা :

‘Literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond with a focus on the role of educators and changing pedagogies’ তথা ‘কোভিড-১৯ সংকট : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা’-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। ১৯৬৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতা দিবস পালন করে। তারপর প্রতিবছর সারা বিশ্বে এ দিবস পালিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৯৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন। জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের প্রবেশদ্বার হচ্ছে সাক্ষরতা। সাক্ষরতার সংজ্ঞা সময়ের পরিক্রমায় পরিবর্তিত এবং বিস্তৃতি লাভ করেছে। অতীতে সাক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞান বা স্বাক্ষর (signature) করা বোঝানো হতো। কিন্তু বর্তমানে সাক্ষরতা (literacy) বলতে বোঝায় ‘মাতৃভাষায় পড়তে পারা, পড়ে অনুধাবন করতে পারা, লিখতে পারা, লিখিতভাবে বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারা, যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা এবং গণনা করতে পারা।’

সাক্ষরতা শিক্ষার প্রথম সোপান। জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি ও প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের এ বিশ্বে সাক্ষরতার বিকল্প নেই। যে জাতি যতো শিক্ষিত, সে জাতি ততো উন্নত ও ক্ষমতাবান। সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, মানুষ সচেতন ও স্বনির্ভর হয়, দেশে জন্মহার কমে, স্বাস্থ্য সূচকের উন্নয়ন, গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। সাক্ষরতার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বল্প সময়ের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নব্যসাক্ষরদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। আর সে লক্ষ্যেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীর পছন্দের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ট্রেড নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশব্যাপী সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমেই কেবল বাংলাদেশের মতো জনসংখ্যাবহুল দেশকে জনসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে। তাহলেই শিক্ষিত, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল উন্নত জাতি হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে সমাদৃত হবে।

বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণার আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। সে লক্ষ্যে যা করণীয় তার সবকিছুই করে যাচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পদার্পন করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ এই চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এখন বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে হলে জাতিসংঘের নির্ধারিত নীতিমালার অর্থাৎ The Human Capital Index ইন্ডিকেটরসমূহ যেমন শিক্ষা, গড় আয়ু ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে হবে। সেই নীতিমালা অন্যতম শর্ত হচ্ছে দেশের জনগণকে শতভাগ শিক্ষিত হতে হবে। বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৭% এখনও ২৫.৩% জনগণ নিরক্ষর। উন্নত সমৃদ্ধ দেশ ঘোষণায় এটি

একটি বড় বাধা। এই বাধাকে অতিক্রম করার লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নানা ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছে। যেমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান সরকার যে মূহুর্তে নানামুখি শিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে ঠিক তখন মরণঘাতী ভাইরাস 'কোভিড-১৯' মহামারি আকারে হানা দিয়েছে। এই কোভিড-১৯ উন্নত দেশ গুলোতেও আঘাত করেছে তবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর এর বিরূপ প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে করোনার অত্যাধিক বেশী প্রভাব পড়েছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সচল রাখার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। এই ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার পূর্বক কিভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে বেগবান করা যায় সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইউনেস্কো ৮ সেপ্টেম্বর ২০২০-এর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে। কোভিড-১৯ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে হলে সকলকে স্বাস্থ্য বিধি পালন করতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত সরকার প্রাথমিক শিক্ষায় 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ বেতার ও সকল কমিউনিটি রেডিওতে "এসো ঘরে বসে শিখি' শিখন প্রোগ্রাম চালু করেছে। বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণের জন্য যুগোপযোগী শিখন সামগ্রী প্রণয়নকল্পে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংগে সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের শিক্ষক, শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞগণকে অবসর হওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচি : মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান প্রণীত হয় এই সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সাক্ষরতা বিস্তারে আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ পূর্বক ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। ১৯৭৩ সালে বেসরকারি উদ্যোগে ঠাকুরগাঁয়ে সাক্ষরতা অভিযান শুরু হয়। একই সালে ঠাকুরগাঁয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । উল্লেখ্য, এ দিনে ঠাকুরগাঁ-এর কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করেন।

১৯৭৩ সালে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ ও অবৈতনিক করেন। ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে একটি অধ্যায়ে দেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। ১৯৭৫ সালে 'বাংলাদেশ সাক্ষরতা সমিতি' গঠনের মাধ্যমে ১৮টি জেলায় ৬৮টি থানার ৩২৫টি গ্রামে গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়। এই সমিতির মাধ্যমে ১৮,০০০ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়।

নব্বই দশকের শুরু থেকে 'সবার জন্য শিক্ষা' অর্জনে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইউনেস্কো'র উদ্যোগে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও 'সবার জন্য শিক্ষা' বিস্তারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় বাংলাদেশ সাক্ষরতা বিস্তারে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সময়ে সাক্ষরতা বিস্তারে বিভিন্ন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে সারা দেশে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করা হয়। এ 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রথমে ২টি জেলা লালমনিরহাট ও চুয়াডাঙ্গা এবং পরে আরও ৫টি জেলা মাগুরা, জয়পুরহাট, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহীকে নিরক্ষরতামুক্ত ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদান করা হয়। ফলে সাক্ষরতার হার ২০০০ সালে ৩৫%-৬০%-এ উন্নীত হয়।

সাক্ষরতা বিস্তারে এ বিশাল অর্জনের জন্য সরকার ইউনেস্কো কর্তৃক প্রদত্ত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিস্বরূপ 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে এ পুরস্কার বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও ২০০৩ সালে আকস্মিকভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অকার্যকর করা হয়। এ সময়ে সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য দেশব্যাপী চলমান 'সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএম)' কর্মসূচির মতো একটি সফল কার্যক্রম বন্ধ করা হয়। এরপর ২০০৫ সালে সরকারের রাজস্ব খাতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো' প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার ২০০৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ২০০৫ সাল থেকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ : শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞান দান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন, দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত-করণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টি এবং বিদ্যালয়- বহির্ভূত ও ঝরে- পড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন প্রণীত হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-৪ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ভূমিকা

এসডিজি-৪ এর লক্ষ্য হচ্ছে ' অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাপূর্ণ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি'। এসডিজি-৪ এর সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন করেছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র গৃহীত কর্মসূচিসমূহ : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪, ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং এসডিজি-৪ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ :

১. **মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) :** দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৫ এবং তদুর্ধ্ব বয়সী নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)' বাস্তবায়ন করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রথম পর্যায়ে ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৫৯,৪৪১ (তেইশ লক্ষ ঊনষাট হাজার চার শত একচল্লিশ) জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১৪টি উপজেলায় ৩৫,০০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১,০০,০০০ (একুশ লক্ষ) জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে অর্থাৎ মুজিব বর্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদান করা হবে।

২. **পিইডিপি-৪ এর আওতায় বিদ্যালয়- বহির্ভূত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা :** সকল শিশুর জন্য মানসম্মত ও যুগোপযোগী শিক্ষা নিশ্চিত করণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং 'চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)' বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় শতভাগে (৯৭.৭৪%) উন্নীত এবং ঝরে, পড়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস ১৭.৯০% কমেছে (APSC-2019)। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতভাগে উন্নীতকরণ, ঝরে পড়া রোধ এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, এগুলো- বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, মিড-ডে মিল, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন, পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হ্রাস, ইত্যাদি।

প্রাথমিক শিক্ষায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জনের পরেও দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে এখনও ২.২৬% শিশু বিদ্যালয়- বহির্ভূত এবং ১৭.৯০% বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে (APSC-2019)। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এসব শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণে পিইডিপি-৪-এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয়- বহির্ভূত ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যালয়- বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ইতোমধ্যে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ৬টি জেলায় - ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জে ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুর শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৯,০০,০০০ (নয় লক্ষ) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর শিখন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড:** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪-এর আলোকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বোর্ডের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, সাক্ষরতা বা মৌলিক শিক্ষা, প্রি-ভোকেশনাল-১ ও ২ স্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। বোর্ডের মাধ্যমে দেশে সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান যারা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে জড়িত তাদের প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশন, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা নিরূপণ, শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান করা হবে।

৪. **উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (এনএফইডিপি):** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু থেকেই প্রকল্পনির্ভর কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যে ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরে কোনো টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠন সম্ভব হয়নি। ফলে দেশে নিক্ষরতা সম্পূর্ণ দূরীকরণসহ জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধিত হয়নি। বর্তমান সরকার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ কর্মসূচিভিত্তিক প্রস্তাবনা 'Non-Formal Education Development Program (NFEDP)' তৈরি করেছে এটি বর্তমানে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এনএফইডিপি'র আওতাভুক্ত বিভিন্ন কম্পোনেন্ট :

- ১৫+ বয়সী ৫০ লক্ষ নিরক্ষরকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে।
- ১৫-৪৫ বৎসর বয়সী ০৫ লক্ষ যুব ও বয়স্ক নব্যসাক্ষরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
- ৬৪ জেলায় ৬৪টি জীবিকায়ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।
- দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি এবং কিছু শহর এলাকায় সর্বমোট ৫০২৫টি ICT বেইজড স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) কার্যক্রম শুরু করা হবে। তন্মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০টি সিএলসি নির্মাণ করা হবে।

রূপকল্প-২০৪১ ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। জীবনব্যাপী শিক্ষার দ্বার অবারিতকরণে সবার আগে প্রয়োজন সাক্ষরতা অর্জন। BBS-এর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, (Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2019) বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৭% অর্থাৎ ২৫.৩% লোক নিরক্ষর। এ বিশাল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা জ্ঞানদান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার কোনো বিকল্প নেই। তাই শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত মানুষকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। এজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাক্ষরতা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে পরিণত করণে সরকারের পাশাপাশি বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসেবে সকল রাজনৈতিক দল ও সুশীল সমাজকে অগ্রসর হতে হবে। যাতে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর উন্নত সমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তবেই আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হবো।

করোনা ভাইরাস তার অদৃশ্য শক্তির প্রকোপে বিশ্বের জনজীবনকে আতঙ্কগ্রস্ত করছে। বিশ্বের দিশেহারা মানুষ করোনা ভাইরাসকে নির্মূল করার পথ খুঁজছে। নিকট অতীতে এ ধরনের ভাইরাসজনিত রোগের প্রবল প্রতাপে এত মানুষের প্রাণহাণি হয়নি তাই বিশ্ববাসী এই মহাসংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত ছিল না। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, জনসমাবেশ এড়িয়ে চলা, আন্তরিকতা পূর্ণ করমর্দন ও আলিঙ্গন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, সকল স্বাস্থ্য বিধি মেনে দেশে শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন নিশ্চিত করণে সাক্ষরতা, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, সুপারভাইজার, এনজিও কর্মী, সিভিল সোসাইটি এবং জনপ্রতিনিধিদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। করোনা ভাইরাস নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্য বিধি মেনে সাক্ষরতা কার্যক্রম চলমান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

লেখক
মহাপরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিখন কৌশল ও শিক্ষাবিদদের ভূমিকা

আলম আরা বেগম

'করোনা', 'কোভিড-১৯', এই শব্দগুলো সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে পরিচিত। অবোধ ও মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তি ছাড়া সবাই জানেন এই শব্দগুলো কি ভয়ানক অর্থ ধারণ করেছ। বিশ্বব্যাপী এই ব্যাধি তার মরণ থাবা বসিয়েছে। গ্রাস করছে একের পর এক জীবন।

এর সূচনা ডিসেম্বর ২০১৯ সালে চীনের উহান শহরে। তখন বোধ করি মানুষ ভাবতেও পারেনি এটা কত দ্রুত এবং কত ব্যাপকভাবে জীবন সংহারী ভূমিকা নিতে যাচ্ছে। জানুয়ারি ২০২০ চীনের পর ইউরোপের কয়েকটি দেশে ছড়িয়ে পড়ে করোনা। বলা হচ্ছিল, এই রোগ শীত প্রধান দেশের জন্য ভয়ানক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তেমন একটা বিস্তার লাভ করে না বা তেমন ক্ষতিকর হবে না। আমাদের দেশ বাংলাদেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ। এদিকে তেমন একটা বিপদজ্জনক হবে না করোনা।

মার্চ ২০২০ : সবার ধারণা ভুল প্রমাণ করে এদেশে ঢুকে পড়ে করোনা এবং ছড়িয়ে যেতে থাকে। ফলে বন্ধ হয়ে গেল স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, বাজার, বন্দর সবকিছু। স্থবির হয়ে পড়ল জনপদ। তখনো ভাবা হচ্ছিল যে, করোনা খুব শীঘ্রই বিদায় নেবে। না, বাস্তবে সেটি ঘটলো না। এখন আমাদের করণীয় কি? সারাজীবন ঘরবন্দী থাকতে পারে না মানুষ। সবকিছু থেমে থাকতে পারে না। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে হবে। জনজীবন সচল করতে হবে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছিলেন, যত মত তত পথ। এখনকার জ্ঞানী-জনেরা বলেন, যত মুশকিল তত আসান। যত সমস্যা ততটাই সম্ভাবনা। জীবনযাত্রা কখনো থেমে থাকে না।

করোনাকে সাথে নিয়েই আমরা কিভাবে পথ চলবো, কিভাবে এগিয়ে যাবো সামনে, ক্রমশ আমরা একের পর এক পন্থা উদ্ভাবন করে যাচ্ছি। এখন প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে অফিস, আদালত চলছে। ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে যে যার জায়গায় ঘরে বসে অংশ নিতে পারছেন বিভিন্ন সভা সমিতিতে। প্রয়োজনে সরাসরি সভায় অংশগ্রহণ করতে হলেও যথাসম্ভব প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে সভায় যাচ্ছেন অনলাইনে পাঠদান করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে টেলিভিশন, রেডিও, কমিউনিটি রেডিও। আমাদের সন্তারেরাও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে অনলাইন ভিত্তিক পড়াশোনা করতে। শিক্ষকেরাও অনলাইনে পাঠদান করছেন। বিভিন্নজনে বিভিন্ন মতামত দিচ্ছে। বলছেন অনলাইনে অংশগ্রহণ করা তেমন একটা ফলপ্রসূ হবে না। ফলে এই পদ্ধতি পুরোপুরি কার্যকর নয়।

এ- ধারণা আংশিক সত্য, তবে পুরোপুরি নয়। নতুন যে কোন ব্যবস্থা মানুষের গ্রহণ করতে বেশ কিছুটা সময় লাগে। সে হিসেবে সকলেই যে নতুন ব্যবস্থার সাথে একমত হতে পেরেছেন বা পারছেন এমনটি নয়। তবে ক্রমশই মানুষ অভ্যস্ত হয়ে উঠছে নতুন ব্যবস্থার সাথে। তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার টার্গেট গ্রুপ যারা তারা কতটা অনলাইন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে পারবে তাঁদের বা অনলাইনের আওতায় আনা যাবে কি সেটাই এই মুহূর্তে বড় চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ যত বড়ই হোক তার সমাধানও পাওয়া সম্ভব।

একজন শিশুকে খুব দ্রুত নতুন কোন ব্যবহারের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া যায়। বড়দের জন্য বিষয়টি একটু কঠিন। তার কারণ অশিক্ষা, অনভিজ্ঞতা, নতুন ব্যবস্থা বা প্রযুক্তি ব্যবহারে ভীতি ও অনাগ্রহ। এসব বড়দের শিক্ষার জন্য অন্তরায়। যাঁরা শিক্ষাবিদ, যারা উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পাঠদান কার্যক্রম নিয়ে কাজ করে

যাচ্ছেন, তাদের মূল লক্ষ্য হবে বড়দের কি করে প্রযুক্তির সাহায্য নিতে অভ্যস্ত করা যায় সেটি নিয়ে কাজ করা। প্রযুক্তি ব্যবহারে আগ্রহ তৈরী করার ক্ষেত্রে তাঁরা ভূমিকা নিতে পারেন।

কাজটা খুব কঠিনও নয়। আজকাল খুব অল্প টাকায় স্মার্ট ফোন সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে গেছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মানুষ টিভি, রেডিও দেখতে ও শুনতে পারে। সবচেয়ে বড় অগ্রগতি দেশে ঘটেছে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে। টাকা পয়সা লেনদেনের জন্য সাধারণ মানুষও এখন মোবাইলে ব্যাংকিং করতে পারছেন। যাঁরা শিক্ষাদান করবেন তাঁরা মোবাইল ব্যবহার করে কিভাবে পাঠদান করবেন তার একটি পর্যায়ক্রমিক পরিকল্পনা করে অগ্রসর হতে হবে। গ্রামের পাড়া মহল্লায় চায়ের দোকানের ছোট টিভির সামনে মানুষ ভিড় করে আজকাল শুধু বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখে না, খবরও দেখে। তাই গণমাধ্যমগুলোর সহায়তা নিয়ে পাঠদান পরিকল্পনা করলে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যকম এগিয়ে নেয়া সম্ভব। শিক্ষাবিদদের কাজ হবে পাঠ্যক্রমগুলো অনলাইন বা টিভি/ বেতার পরিবেশনার উপযোগী করে তৈরি করা যাতে করে মানুষ ঘরে বসে বা ছোট পরিসরে দূরত্ব বজায় রেখে শ্রেণি কক্ষে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ যে জীবন যাপনের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সেই বোধটুকু জাগ্রত করতে পারলেই গণমানুষের আগ্রহ তৈরি করা যাবে। সেই আগ্রহ তাকে তাড়িত করবে নতুন ব্যবস্থাপনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মানুষের আগ্রহ তৈরি করতে হবে প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য। পরিচ্ছন্ন থাকার, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে থাকার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে পাঠ্যক্রম তৈরি ও বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

এভাবে আমরা মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে পারলে করোনা পরিস্থিতি সত্বেও এগিয়ে যাবো এক সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পানে।

আলম আরা বেগম
অতিরিক্ত সচিব (বা : ও অ:)
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

করোনা মহামারি এবং বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে করণীয়

মোঃ শাহ আলম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে।" ('লাইব্রেরি')। মানবাত্মার এই অমর আলোক- যার স্পর্শে মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠে, সকল বন্ধন মোচন করে স্বাধীন হয়ে ওঠে, তাকে কাগজের কারাগার থেকে মুক্ত করার একমাত্র চাবিকাঠি হলো শিক্ষা।

শিক্ষা তাই মানবীয় মৌলিক অধিকারগুলোর অন্যতম। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি শিক্ষা। শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতার আর সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। সাক্ষর জাতি সচেতন জাতি। বাংলাদেশে বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪.৭ ভাগ। নিরক্ষরতা নির্মূলের মাধ্যমে একটি উন্নত জাতি গঠনে বাংলাদেশ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের ৪নং লক্ষ্য-'সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা-লাভের সুযোগ সৃষ্টি' করতে বর্তমান সরকারের সাফল্য বিশ্বস্বীকৃত। কিন্তু করোনা মহামারি এই অর্জন নস্যাৎ করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে।

প্রযুক্তিনির্ভর এই আধুনিক যুগে চীনের উহান শহর থেকে শুরু হওয়া করোনা ভাইরাস মহামারি মানবসভ্যতাকে এক অভূতপূর্ব সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করেছে। করোনা ভাইরাস দ্রুত ধাবমান এই বিশ্বকে স্থবির করে দিয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বাধার মুখে পড়েছে শিক্ষাব্যবস্থা। এতে সারা বিশ্বের প্রায় ১৬০ কোটি শিক্ষার্থীকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। সেই সাথে করোনাভাইরাস মহামারি শিক্ষাখাতের বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে বলে 'কোভিড-১৯ ও পরবর্তী সময়ের শিক্ষা' সম্পর্কে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, দীর্ঘ সময় ধরে স্কুল বন্ধের কারণে পড়াশোনার যে ক্ষতি হচ্ছে তা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে শিক্ষাব্যবস্থায় অর্জিত অগ্রগতিকে ম্লান করে দেয়ার হুমকির মধ্যে ফেলেছে। এটি শুধুমাত্র মেয়ে এবং নারী শিক্ষায় নয় বরং সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। করোনা শিক্ষাক্ষেত্রে যে প্রভাব ফেলেছে তার কারণে আগামী বছর প্রায় ২ কোটি ৩৮ লাখেরও বেশি শিশু এবং তরুণ স্কুল-কলেজে যেতে পারবে না বা ড্রপ আউটের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সংক্ষিপ্ত এ প্রতিবেদনে বলা হয়, আগে থেকেই বিদ্যমান শিক্ষার সংকট যাতে বিপর্যয়ে পরিণত না হয় সেজন্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্বের ১৬০টিরও বেশি দেশে স্কুল বন্ধ ছিল। যা প্রায় ১০০ কোটি শিক্ষার্থীর পড়াশোনাতে প্রভাব ফেলেছে। কমপক্ষে ৪ কোটি শিশু তাদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আড়াই কোটিরও বেশি স্কুল-বয়সী শিশু স্কুলে যেতে পারেনি।

বাংলাদেশে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হবার পর সরকার শিক্ষার্থীদের জীবনরক্ষার্থে আর্থ-সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহও বন্ধ ঘোষণা করে। ১৭ মার্চ ২০২০ থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অদ্যাবধি এই ছুটি বহাল রয়েছে। সম্প্রতি সরকার ৩ অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত এর

মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। এই অপ্রত্যাশিত দীর্ঘ ছুটি প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে সরকারের লক্ষ্য অর্জনকে হুমকিতে ফেলেছে। করোনা সংকটে প্রাথমিক স্তরের প্রায় দেড় কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এই নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে শিশুরা যেন বাড়িতেই বিভিন্ন বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের পড়ালেখা অব্যাহত রাখতে পারে এবং এই জরুরি অবস্থার নেতিবাচক প্রভাব যেন শিশু ও সমাজের উপর না পড়ে সেজন্য বাংলাদেশ সরকার, তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সংসদ টেলিভিশনে প্রচারিত 'ঘরে বসে শিখি', বেতারে প্রাথমিকের পাঠ প্রচার এবং অন্যান্য অনলাইনভিত্তিক মাধ্যমে পাঠ প্রচার সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে শতভাগ শিক্ষার্থীকে এই ব্যবস্থার আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। ফলে তাদের পক্ষে পরবর্তী স্তরের শিখনফল অর্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

করোনা মহামারি চলাকালে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নোক্ত বিভিন্ন-মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি চলাকালে সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ

সিলেবাস সংক্ষিপ্তকরণ :

দীর্ঘ বন্ধের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে শিক্ষার্থীরা যেন যথাসময়ে তাদের শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে পারে এজন্য সিলেবাস সংক্ষিপ্তকরণ প্রয়োজন। পাঠ্যসূচির একান্ত আলোচ্য বিষয়াদির বাইরের বিষয়গুলো আপাতভাবে বাদ দিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে গেলে এই সিস্টেম লস কাটিয়ে ওঠার সুযোগ থাকবে। সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয় কমিয়ে দুটি পরিমার্জিত পাঠ-পরিকল্পনা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২০ এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০২০) প্রণয়নপূর্বক অনুমোদন প্রদান করেছে।

অনলাইনে কোর্স ম্যাটেরিয়াল সরবরাহ :

অনলাইনে (ফেসবুক গ্রুপ/গুগল ক্লাসরুম) প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকেরা কিছু কোর্স ম্যাটেরিয়াল আপলোড করতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থীরা ন্যূনতম পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত থাকে। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু স্লাইড, কিছু তথ্য, সংক্ষিপ্ত ভিডিও ইত্যাদি নিয়মিত বিরতিতে প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীরা তাদের সময় সুযোগমতো সেগুলো দেখে রাখতে পারবে। এতে করে তাদেরকে একাডেমিক কার্যক্রমের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন না করে অন্তত কিছুটা সংযুক্তি ধরে রাখা সম্ভব।

ওপেন বুক এক্সাম :

অনলাইন শিক্ষা-কার্যক্রমের একটি বড় দুর্বলতার ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন। এক্ষেত্রে 'ওপেন বুক এক্সম' ভালো একটি বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে। ওপেন বুক এক্সমের ক্ষেত্রে সাধারণত এমন একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়, যে প্রশ্নগুলো অধ্যয়নকৃত বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও বইয়ে সরাসরিভাবে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না। এই ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি উৎসাহিত করা হলে অনলাইনে পরীক্ষা নেয়া যেমন সহজ হবে, তার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশও বেশ ভালোভাবেই হয়ে উঠবে।

করোনা-পরবর্তীকালে সম্ভাব্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

অনলাইনভিত্তিক শিক্ষা-কার্যক্রম চালু রাখা :

শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি অভূতপূর্ব বাস্তবতার মুখোমুখি বাংলাদেশ। এ দেশে এত দিন অনলাইন শিক্ষার বা সনদের কোনো স্বীকৃতি ছিল না; এখনো কোনো আইনি কাঠামো তৈরি হয়নি। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর যে অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা প্রশংসনীয়। নিকট ভবিষ্যতেই তাদের

মূল্যায়নসহ সব কার্যক্রম অনলাইনে চালানোর অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। ভবিষ্যতে বিরাট বিরাট অবকাঠামো নিয়ে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকবে বলে মনে হয় না। এজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকা পর্যন্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করে অনলাইন শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

এক ডেস্ক এক শিক্ষার্থী কর্মসূচি:

করোনা পরবর্তীকালেও দীর্ঘ সময়ের জন্য আমাদেরকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষগুলোতে যাতে পর্যাপ্ত দূরত্ব মেনে চলা যায় সে নিমিত্তে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্যে আলাদা ডেস্ক বা আলাদা চেয়ার নিশ্চিত করা যেতে পারে। এতে করে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সরাসরি সংস্পর্শের বাইরে থাকবে।

সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে গুরুত্বারোপ:

দীর্ঘ লকডাউন পরবর্তী সময়ে খুব স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের ওপর অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক পড়াশোনার চাপ তৈরি হবে। তাই একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমগুলোতে জোর প্রদানের মাধ্যমে একাধিক উপযোগিতা লাভ করা সম্ভব। আমরা যদি এর গঠনগত কিছুটা পরিবর্তনে গুরুত্বারোপ করি, তবে তা আমাদের অতিরিক্ত কিছু সুবিধা প্রদান করতে পারে। সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম, যেমন– বক্তব্য প্রতিযোগিতা, বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি বিষয় যদি আমরা একাডেমিক বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিকভাবে চর্চা করার ওপর জোর দেই, তবে এর ফলে একাডেমিক শিক্ষার বেশ বড় একটি অংশও 'উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা' পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে। অর্থাৎ সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমগুলোকে বিনোদন হিসেবেই উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পরিবর্তন করে নিয়ে আসতে হবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বাস্থ্যসূচি প্রণয়ন:

করোনাভাইরাস চলমান বা পরবর্তী সময়কালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যথাযথ স্বাস্থ্যসূচি প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে ঢোকার পূর্বে যথাযথভাবে জীবাণুমুক্ত হয়ে প্রবেশ করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদির ওপর আলাদাভাবে বিধি-নিষেধ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য উৎসাহিত করতে প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাস্থ্যবিধির ওপর আলাদাভাবে নাম্বর প্রদান করতে পারে।

হোম টিচিং-এর প্রশিক্ষণ:

করোনা ভাইরাসের প্রকোপ খানিকটা কমে আসার পর রাষ্ট্রের কাঠামোগুলো কিছুটা স্বাভাবিক হতে পারে। ধীরে ধীরে খুলতে পারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোও। তবে অতীতের বিভিন্ন মহামারীর ক্ষেত্রে সেকেন্ড ওয়েভের মতো ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে বিধায় আমাদের পুনরায় দীর্ঘ লকডাউনে যাওয়ার মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি রাখতে হবে। এরই অংশ হিসেবে শিশুদের বাবা-মায়েদের 'হোম টিচিং'-এর প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সাধারণত শিশুরা স্কুল-কলেজে বা এর বাইরেও আলাদাভাবে অন্য শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে বিধায় তাদের পড়াশোনা নিয়ে বাবা-মায়েরা অতটা নজর রাখার চেষ্টা করেন না। কিন্তু লকডাউনের মতো সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এবং অন্য শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর সুযোগ থাকে না। সেজন্য শিশুদের যথাযথভাবে পড়াশোনা চালিয়ে নেয়ার জন্য ও তাদের বাসায় পড়ানোর জন্যে তাদের বাবা-মায়েদের আগে থেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

বাজেট বৃদ্ধি:

শিক্ষাখাতকে ডিজিটালাইজেশন করার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ মতামত অনুসরণ করা হলে এই স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠা কিছুটা সম্ভবপর হতে পারে। এছাড়াও

শিক্ষাক্ষেত্রে আলাদাভাবে 'আপদকালীন বাজেট' অনুমোদন দেয়া যেতে পারে, যা থেকে পরবর্তীতে অনাহুত পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য আমাদের সবকিছু এখন নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। এক্ষেত্রে দেশের সব পেশা, বৃত্তি, সম্প্রদায় ও পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীকে মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা হতে হবে আরও সুচিন্তিত। সম্মিলিত প্রয়াসই পারে শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের পুনর্যাত্রা সফল করতে।

মোঃ শাহ আলম (অতিরিক্ত সচিব)
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে কোভিড-এর প্রভাব

শামস আল মুজাদ্দিদ

২০২০ সালের জুন মাসে ইউনেস্কো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১.২ বিলিয়ন অর্থাৎ বিশ্বজুড়ে মোট ছাত্র সংখ্যার ৬৮% কোভিড মহামারীর কারণে তাদের নিয়মিত লেখাপড়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অন্ততপক্ষে ১৪০টি দেশের ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা কোভিড মহামারীর কারণে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বাংলাদেশেও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীর ভাষ্য অনুযায়ী, প্রায় চার কোটি ছাত্রছাত্রী বর্তমানে স্কুলে যেতে পারছে না। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ পড়াশোনা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোভিড প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে সরকার ছাত্রছাত্রীদের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিতে ন্যায়সঙ্গত কারণে অসম্মতি প্রকাশ করেছেন এবং সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছেন। তবে পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকলে কিভাবে পর্যায়ক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে ধীরে ধীরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা যায় এ ব্যাপারে সরকার চিন্তাভাবনা করছেন। এই খানে উল্লেখ্য যে, ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু মাত্র যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছে না তা নয়; কোভিড এর কারণে সমস্ত সমাজ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর প্রভাব নিশ্চিতভাবে দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের উপর আরো প্রকট হয়ে পড়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। তবে এ ব্যাপারে গবেষণালব্ধ সঠিক তথ্য চিত্র এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এযাবত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যেতে পারে যে, কোভিড মহামারীর ফলে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রছাত্রীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ সামাজিক নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অতএব যে সমস্ত সমস্যা বিরাজমান ছিল সেই সমস্ত সমস্যার সাথে আরো যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জসমূহের মধ্যে আছে ক্রমবর্ধমান ঝরে পড়ার হার, ডিজিটাল বৈষম্য, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব, পুষ্টিহীনতা ও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ আরো অনেক সমস্যা এবং সীমাবদ্ধতা। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি করোনা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত থাকে তবে দারিদ্র সীমার নিচে জনসংখ্যার হার ২৩% থেকে বেড়ে ৪৩% এ উপনীত হতে পারে। এর ফলে ৭৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে আসার আশংকা রয়েছে। ফলে ধরা যায়, দারিদ্র্য সীমারেখার নিচে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ১ কোটি ৬০ লক্ষ।

বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, ১ কোটি ৬০ লক্ষ শিশু দারিদ্রসীমার নিচে এবং স্কুলের বাহিরে অবস্থান করছে তাদের অনেকেই স্কুলে ফেরত আসতে পারবে না। এখানে উল্লেখ্য, যদিও প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রায় সার্বজনীন সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলেও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে ঝরেপড়ার মাত্রা এখনো কিছুটা বেশি। ব্যানবেইস এর প্রতিবেদন অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ঝরেপড়ার হার বর্তমানে ৩৭ শতাংশ; অপরদিকে মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার ১৯ শতাংশ। কোভিড মহামারীর নেতিবাচক প্রভাবের সিংহভাগ পড়বে ছাত্রীদের উপর যা লিঙ্গবৈষম্য আরো বৃদ্ধি করবে।

খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির ব্যাপারেও কোভিড মহামারী নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার কারণে প্রতি বছর ১ বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিশ্ব খাদ্য সংস্থার সহায়তায় ১০৪টি উপজেলায় সুবিধাবঞ্চিত ৩০ লক্ষ স্কুল ছাত্রছাত্রী মাঝে পুষ্টিকর বিস্কুট সরবরাহ করে আসছে। কোভিড মহামারীর কারণে এই প্রকারের সহায়তার আওতা আরো বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। তাছাড়া সামগ্রিকভাবে করোনার কারণে জাতীয় অর্থনীতিতে চাপ পড়ায় বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ঝরেপড়ার হার বৃদ্ধি এবং তার সাথে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কোভিড মহামারীর শিক্ষা ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাবের কিছু উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তের যেসব শিশু কিন্ডারগার্টেনে পড়তে যেত তাদের পক্ষে আর স্কুলে যাওয়া সম্ভব হবে না। ফলে সরকারি স্কুলের উপর চাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া বেসরকারি খাতের শিক্ষকরা বাধ্য হবেন অন্য পেশা খুঁজে নিতে। সরকারকে এ সমস্ত সম্ভাব্য বিষয় বিবেচনায় রেখে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

তাছাড়া বিশ্বজুড়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আইসিটি ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে আইসিটি কতটুকু কার্যকরভাবে ব্যাপক ছাত্রছাত্রীর জন্য সুলভ করা যাবে এ ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ৫% জনগোষ্ঠীর কাছে কোন মোবাইল ফোন নাই (MCS, 2019)। কেবল ৫ দশমিক ৬ শতাংশ জনগোষ্ঠীর কাছে কম্পিউটার কিংবা ট্যাবলেট আছে। সারাদেশে ইন্টারনেট সুবিধা আছে শুধু ৭% জনগোষ্ঠীর, তার মধ্যে ৫৩% ইন্টারনেট সুবিধা আছে শহরে আর ৩৩% ইন্টারনেট সুবিধা আছে গ্রামে। উপরন্তু ১২ শতাংশ গৃহস্থালি মহিলার কাছে কোন মোবাইল নাই।

আইসিটিতে এই ধরনের বৈষম্যমূলক পরিস্থিতির কারণে দূরশিক্ষণ এর প্রয়াস কেবল বর্তমান বৈষম্যকে আরো প্রকট করবে বলে অনেক বিশেষজ্ঞর ধারণা। তবে এই ক্ষেত্রে পরিকল্পনা করার জন্য প্রধান অন্তরায় হচ্ছে কোভিড বিষয়ে অনিশ্চয়তা। এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবে কত সময় ধরে কোভিড প্রাদুর্ভাব বিশ্বময় থাকবে এ ব্যাপারে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। তবে অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বিশেষজ্ঞের মনে হচ্ছে, কোভিড প্রতিরোধ করা গেলেও একে সম্পূর্ণভাবে দূর করা হয়তো অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না। এই ক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছে যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা না হলেও অন্তত মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। তা না হলে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় অর্জন এবং সাফল্য ধরে রাখা কঠিন হবে। এর জন্য শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর নেতৃত্বে ৯ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা বঞ্চিত শিশুর ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও গুরুত্বের দাবি রাখে। অনেক ক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ এর জন্য মৌলিক উপাদান অর্থাৎ এই সমস্ত শিশুদের পিতামাতাদের কাছে মোবাইল সুবিধা নেই। মোবাইল সুবিধা থাকলেও এন্ড্রয়েড মোবাইল তাদের কাছে নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য দূর করার জন্য অদূর ভবিষ্যতে সরকার হয়তো প্রতিটি শিশুর জন্য একটি ট্যাবলেট এর সংস্থান করবেন। তাছাড়া সমস্ত দেশজুড়ে ইন্টারনেট সুবিধা এবং ইন্টারনেটের স্পিড বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহ যত দ্রুত নিশ্চিত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দেওয়া প্রয়োজন। ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়ন কেবল শিক্ষাব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করবে না বরং দেশের সমস্ত আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় এর একটি ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। কিন্তু ইন্টারনেট সুবিধা সারা বাংলাদেশে সমানভাবে নেই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং আইসিটির ব্যাপারে অবকাঠামোগত ঘাটতি রয়েছে যার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের কাছে আইসিটি বা দূরশিখণের সুবিধা পৌঁছানো সম্ভব নয়। দূরশিক্ষার মাধ্যমে শিখন পদ্ধতি এবং ক্লাসরুমে শিখন পদ্ধতির মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়ে গেছে। অতএব দূরশিক্ষণের বিষয়টি কেবল আইসিটি কিংবা প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত নয় বরং কারিকুলাম এবং কারিকুলামকে শিখন শিক্ষা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদেরকে পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। সঙ্গতকারণেই দূরশিক্ষণ শিখন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য যেহেতু ভিন্নতর শিক্ষা পদ্ধতি এবং কৌশল প্রয়োগ প্রয়োজন সেহেতু এর কার্যকর প্রয়োগ এর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সহ পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। এই সমস্ত পরিবর্তন কেবলমাত্র মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সম্ভব।

বর্তমান সংকট মোকাবেলা করার জন্য স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু সুপারিশ

স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, স্কুলগুলো যেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফের করোনা প্রতিরোধ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য নির্দেশিকা মেনে চলে।

যেহেতু দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের পিতা-মাতা করোনার কারণে অত্যন্ত গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন, তাদের এই সংকট কিছুটা হলেও প্রশমনের জন্য বৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে নিয়মিতভাবে ব্যাংকের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে দেওয়া।

ছাত্রছাত্রীদের পরিপূরক পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সহ মিড-ডে-মিল কর্মসূচি চালু করা যেতে পারে। এর ফলে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির ঘাটতি যেমন কিছুটা হলেও পূরণ করা সম্ভব হবে, তার সাথে ঝরেপড়াও অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।
কেবল কোভিড প্রতিরোধের জন্য নয় দূর শিক্ষণ একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং দূর শিক্ষণকে প্রযুক্তিগতভাবে ছাত্রছাত্রীদের যতটা কাছে আনা যাবে ততই শিক্ষার মান উন্নয়নের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোভিড মহামারী প্রতিরোধের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে যদি একটি বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে শিক্ষার পিছনে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা অত্যন্ত জরুরি। তবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষানীতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা এবং শিক্ষা প্রশাসনের যথাযথ সংস্কারও প্রয়োজন।

পরিচালক
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

করোনাকালীন সাক্ষরতা ও কিছু কথা

বাহালুল মজনুন চুন্নু

করোনা ভাইরাসের থাবায় থমকে আছে পুরো বিশ্ব। দুই কোটির বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত হয়েছে, আর প্রাণ হারিয়েছে আট লাখের কাছাকাছি মানুষ। এমন ভয়াবহ মহামারী মানুষকে করে রেখেছে গৃহবন্দী। এর কবলে পড়ে মানুষের জীবন-জীবিকা বন্ধ হয়ে পড়েছে। চারিদিকে কেবল নেই নেই আর্তনাদ, হাহাকার। সামাজিক দূরত্ব বজায়ের বিধির কারণে মানব সভ্যতার শুরু থেকে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থায় ধরেছে চির। দীর্ঘ গৃহবন্দিত্বে মানুষের মাঝে দেখা দিচ্ছে নানাবিধ মানসিক ব্যাধি। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির কারণে স্বাভাবিকভাবে বন্ধ হয়ে আছে সকল ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ফলে বিশ্বজুড়ে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি হয়েছে ভীষণ শিখন ক্ষতির। স্বাভাবিকভাবে অন্যসব কিছুর মতোই মুখ থুবড়ে পড়েছে সাক্ষরতা কার্যক্রম। করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা বিবেচনা করে এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাওয়া সাক্ষরতা কার্যক্রমকে স্বাভাবিক করার জন্য এবারের 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস'-এর প্রতিপাদ্য "কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা"। পরিবর্তন চিরন্তন সত্য একটা বিষয়। কোভিড পরিস্থিতি সাক্ষরতা কার্যক্রমে যে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তার থেকে পরিবর্তন পেতে হলে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিখন-শেখানো কৌশলেও পরিবর্তন আনতে হবে। এটাই হচ্ছে এবারের প্রতিপাদ্যের মূল কথা। মূলত সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এখন সারাবিশ্বে অনলাইন, বেতার এবং টেলিভিশন প্রোগ্রামের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। তবে কিছু দেশ ব্যতিক্রমভাবে তাদের সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন জর্ডানের 'উই লাভ রিডিং' তথা আমরা পড়তে ভালোবাসি প্রোগ্রাম সারাবিশ্বের পঞ্চান্নটি দেশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই করোনার সময় এরা অভিনব এক পদ্ধতিতে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা জোরে জোরে বই রিডিং পড়ে প্রতিবেশী শিশুদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। তাছাড়া এরা ফ্রি অডিও এবং বই সরবরাহ করছে যা শিশুদের বই পড়ার প্রতি আগ্রহী করে তুলছে এবং তাদের সাক্ষরতাকে ধরে রাখতে সহায়তা করছে। এভাবেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম কৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে সাক্ষরতা কার্যক্রমের জন্য। তবে আরো কার্যকরী কৌশল উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষাবিদদের কাজ করতে হবে।

১৯৬৭ সাল থেকে চালু হওয়া আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে এই কারণে যে, এটি বিশ্ব সম্প্রদায়কে মনে করিয়ে দেয় যে, সাক্ষরতা ব্যক্তি, গোষ্ঠি এবং সমাজ– সবার জন্যই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। সাক্ষরতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার যাত্রা শুরু হয়ে যায়। সাক্ষরতা, শিক্ষা ও উন্নয়ন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। এমনকি একটি দেশের উন্নয়ন পরিমাপের অন্যতম সামাজিক সূচক সাক্ষরতার হার। সাক্ষরতা মানুষকে কর্মক্ষম ও মানবসম্পদে পরিণত করে। সাক্ষরতার মাধ্যেমে জ্ঞানার্জনের দ্বার উন্মুক্ত হয় যা জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করে দেয়। তাই সাক্ষরতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার হিসেবে বিশ্বে গৃহীত হয়ে আসছে। এটি ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। দারিদ্র্য হ্রাস, শিশু মৃত্যু রোধ, সুষম উন্নয়ন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি বিকশিতকরণের ক্ষেত্রেই কেবল সাক্ষরতা অনন্য ভূমিকা পালন করে না, এটি একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক মনোবল বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। একজন নিরক্ষর বা সাক্ষরতা জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিকে সমাজের 'বোঝা' বলে বিবেচনা করা হয়; কেননা, বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নূন্যতম শিক্ষা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরী। একটি উৎপাদনশীল-উন্নয়নমুখী

-কর্মদক্ষ-সচেতনমুখী-আলোকিত ও সুশৃংঙ্খল জাতি গঠনে সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। শিক্ষার প্রথম পাঠ সাক্ষরতা। সাক্ষরতা অর্জনের মধ্যে দিয়েই একজন মানুষ তার শিক্ষাজীবন শুরু করে। সাক্ষরতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে একজন মানুষ তার অর্জিত দক্ষতাকে শিখন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সারাজীবন যেমন শেখার কাজ অব্যাহত রাখতে পারে, তেমনি স্বশিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে মাথা উঁচু করে সমাজে স্থান করে নিতে পারে। জ্ঞানভিত্তিক ডিজিটাল সমাজ নির্মাণের মূল ভিত্তিই হলো সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জন করা। তাছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রমকে টেকসই করার ক্ষেত্রেও সাক্ষরতার বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, বিশ্বে এখনো প্রাপ্ত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর প্রায় আটাত্তর কোটিই সাক্ষর নয়। অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রতি পাঁচজনের একজন নিরক্ষর। আর এই জনগোষ্ঠীর ৬৪ শতাংশই নারী। শিশুদের ক্ষেত্রেও চিত্রটা উদ্বেগজনক। জাতিসংঘ ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষা স্লোগানের পরও বিশ্বের সাড়ে ৭ কোটিরও বেশি শিশুই জানে না কী করে লিখতে পড়তে হয়। এজন্যই আমরা দেখি, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' (এসডিজি) পূরণের জন্য সাক্ষরতা দক্ষতা অজর্নকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৭ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ এখনো নিরক্ষর। এটি খুবই উদ্বেগজনক। তবে স্বাধীনতার পর সাড়ে সাত কোটি মানুষের মাঝে যেখানে সাক্ষরতার হার মাত্র ২০ শতাংশ ছিল, ষোলো কোটি মানুষের মাঝে তা ৭৪.৭ শতাংশ। সাক্ষরতার হারের দিক দিয়ে এই যে ক্রমোন্নতি তা কিন্তু আশাব্যঞ্জক। এই ক্রমোন্নতির সূত্রপাতই হয়েছে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে। একটা সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। বিশেষ করে পাকিস্তান আমলে এদেশের অধিকাংশ মানুষই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এই বিষয়টি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পীড়া দিত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই দেশের জনগণকে সাক্ষর না করা গেলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য যুগপৎভাবে বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতিহারে নিরক্ষতাকে অভিশাপ হিসেবে বিবেচনা করে তা দূরীকরণে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। এতে নিরক্ষরতা দূরীকরণে নয়া কৌশল ও প্রচলিত নিয়মবর্হিভূত পন্থা অনুসরণের কথা বলা হয়, যেমন 'জাতীয় সার্ভিস প্রোগ্রাম' হিসেবে প্রয়োজনে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাজে লাগানোর বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য বঙ্গবন্ধু নানা ধরনের পদক্ষেপ নেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হওয়া সংবিধানের সতের নম্বর অনুচ্ছেদে তাঁর নির্দেশনায় একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত পর্যাপ্ত বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাঠদানের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের ওপর বঙ্গবন্ধু যে অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন তার প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের প্রথম বাজেটে। গণশিক্ষা বিস্তারে তথা নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য জরুরি ভিত্তিতে বরাদ্দ করেছিলেন আড়াই কোটি টাকা। সাক্ষরতা বা বয়স্ক শিক্ষার (১৫+) জন্য ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে প্রণীত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয় যার ওপর ভিত্তি করে সাক্ষরতা কার্যক্রম বিস্তারে গ্রহণ করা হয় নানামুখী পদক্ষেপ। তাঁর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচিতেও সাক্ষরতাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে দেশে সাক্ষরতার হার দীর্ঘকাল স্থবির অবস্থায় থাকলেও ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' গ্রহণ করা হয়েছে। দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক ১৫-৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষের জন্য দেশব্যাপী 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প' (৬৪ জেলা) নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে ৬৪টি জেলায় ৬৪টি জীবিকায়ন দক্ষতা প্রশিক্ষণ

কেন্দ্র স্থাপন করে নব্যসাক্ষরদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত করে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। নব্যসাক্ষরদের দক্ষতাকে আরো শাণীত ও পরিশীলিত করতে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অভিপ্রায়ে তাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শেখানো হচ্ছে। কেননা বর্তমান যুগে একজন মানুষ কেবল সাক্ষর হলেই হবে না, তাকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারও জানতে হবে। বর্তমান ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কৃষি, ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ সর্বক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করা হচ্ছে। নব্যসাক্ষরদের যদি এই সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে তবে তাদের পক্ষে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত হওয়া সম্ভব হবে না; যা টেকসই ডিজিটাল বাংলাদেশ হওয়ার অন্তরায়। এজন্যই সরকার নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষরতা অর্জন, তা ধরে রাখা এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তবে করোনা আমাদের স্বাস্থ্য সাক্ষরতার দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এদেশের বেশীরভাগ মানুষ স্বাস্থ্য সচেতন নয়। করোনার ঝুঁকির মুখেও মানুষ যেরকম স্বাস্থ্যবিধি অমান্য করেছে তা প্রমাণ করে যে আমরা আসলে স্বাস্থ্য সাক্ষরতা অর্জন করতে পারিনি। একটা সময় পর্যন্ত সাক্ষরতা বলতে লিখতে, পড়তে, বলতে পারা ও হিসাব করার দক্ষতাকে বোঝানো হলেও যুগের প্রয়োজনে সাক্ষরতা বিষয়টি জীবনের মৌলিক বিষয়াবলির সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। ডিজিটাল যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য যেমন ডিজিটাল সাক্ষরতা অর্জন করতে হয়, তেমনি সুস্থ থাকার জন্যও মানুষের স্বাস্থ্য সাক্ষরতা অর্জন করা জরুরি। করোনার পরিস্থিতিতে বেতার, টিভি, পত্রিকা ও অনলাইনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ডিজিটা-লসহ বিভিন্ন মৌলিক সাক্ষরতা অর্জন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে আরো কীভাবে এই কার্যক্রমকে বেগবান করা যায়, কীধরনের পরিবর্তনশীল শিখন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেজন্য দেশের শিক্ষাবিদদের কাজে লাগানোর জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বাহালুল মজনুন চুন্নু,
লেখক, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ

বৈশ্বিক মহমোরি কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশে সাক্ষরতা শিক্ষা

প্রফেসর ড. অরুণ কুমার গোস্বামী

কোভিড-১৯ শুরু হওয়ার আগে থেকেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের মূলনীতি এবং ই-৯ এর ঘোষিত প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক শিক্ষা তথা সাক্ষরতা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত অনেক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। উল্লেখ্য, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭ (ক), (খ) এবং (গ) তে সবার জন্য শিক্ষার বিষয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদগুলোতে, 'একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য ; সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য; এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কার্যকর' ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশ ই-৯ ভুক্ত একটি দেশ। ইংরেজি 'ই' অক্ষর দ্বারা এডুকেশন বা শিক্ষা বোঝানো হয়েছে। আর "৯" দ্বারা বোঝানো হয়েছে নয়টি দেশ। ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত সবার জন্য শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে নয়টি দেশের, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, মিশর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া এবং পাকিস্তানের সমন্বয়ে গঠিত উদ্যোগ ই-৯। ওয়ার্ল্ডোমিটার প্রদত্ত উপাত্ত অনুযায়ী বিশ্বের মোট ৭৮০ কোটি ৭৮ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে ৪১৩ কোটি ৪১ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৫২.৯৫ ভাগ লোক এবং বিশ্বের নিরক্ষর জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগ বাস করে এই নয়টি রাষ্ট্রে। ১৯৯৩ সালে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত 'সবার জন্য শিক্ষা' [এডুকেশন ফর অল (ইএফএ)] শীর্ষ সম্মেলনে ই-৯ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ই-৯ উদ্যোগ এমন একটি ফোরাম যেখানে এই দেশগুলো শিক্ষা সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা আলোচনা করে, সর্বোত্তম অভ্যাসগুলো বিনিময় করে, এবং 'সবার জন্য শিক্ষা' অভিযানের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে।

ই-৯ ভুক্ত দেশগুলো তাৎপর্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি লাভ করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হওয়ার আগে থেকেই, ই-৯ ভুক্ত বাংলাদেশ শিক্ষা ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এছাড়া, ই-৯ দেশগুলোর মধ্যে ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং মেক্সিকো জি-২০ এর সদস্য। মেক্সিকো ওইসিডি সদস্য। অপরদিকে চীন হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জিডিপির দেশ। ভারত এবং ব্রাজিলও বিশ্বের উপরের দশটি অর্থনীতির দেশের মধ্যে আছে। ইন্দোনেশিয়াও দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ১৯৯৩ সালে যখন ই-৯ যাত্রা শুরু করেছিল তখন এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো বিশ্বের মোট জিডিপির শতকরা মাত্র ১৬.৫ ভাগ উৎপন্ন করত। এখন ই-৯ ভুক্ত এসব দেশ বিশ্বের মোট জিডিপির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগের প্রতিনিধিত্ব করে। ই-৯ এর সর্বশেষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় ২০১৭ সালের ৫ থেকে ৭ ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে ঢাকা ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, 'ই-৯ ভুক্ত দেশগুলোর জনগণের একটি অনন্য অংশীদারিত্ব হিসেবে আমরা আমাদের শক্তি, সম্পদ এবং সৃজনশীলতা ২০৩০ সালের মধ্যে শিক্ষার লক্ষ্য পূরণে উৎসর্গ এবং আমাদের নিজ নিজ দেশে ও বিশ্বের জন্য এইসব অঙ্গীকার পুনঃনিশ্চিত করছি।'

যাহোক, উপরোল্লিখিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার পূরণে বাংলাদেশ আগে থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে আসছে। এর জন্য ২০০৫ এর এপ্রিলে রাজস্ব খাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সৃষ্টি করেছে। এই ব্যুরো জাতীয় পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় অনেক অবদান রাখছে এবং এর ফলে সংগঠিত পদ্ধতিতে দেশে সাক্ষরতার বিস্তার ঘটছে। অপরদিকে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ পাস করেছে। এ আইনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে 'শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরজ্ঞানদান, জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবিকায়ন. দক্ষ মানবসম্পদে পরিণতকরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের যোগ্যতা সৃষ্টিকরণ এবং বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিশুদের শিক্ষার বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি'।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর ওয়েবসাইটে এই ব্যুরো সম্পর্কে বলা হয়েছে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য জাতীয় পর্যায়ে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান। এটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি কাঠামো বাস্তবায়ন এবং সামগ্রিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদানে পেশাদ-ার নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে। এজন্য এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে–স্বল্পমেয়াদি বিচ্ছিন্ন প্রকল্প প্রণয়নের পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সরকারি সংস্থা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংগঠন, চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠান এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বাজারজাতকারী সংস্থার মধ্যে অংশীদারীত্ব উন্নয়ন ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করে আসছে। সর্বোপরি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সরকারি সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), সিভিল সোসাইটি এবং উন্নয়ন অংশীদারদের সহযোগিতায় একটি সমন্বিত সাব-সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদান করে যাচ্ছে।

যাহোক, করোনাভাইরাসের সংক্রমণরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা ক্ষেত্রগুলো বন্ধসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে সরকার কর্তৃক শিক্ষা তথা সাক্ষরতা শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত অনেক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন থমকে গিয়েছে। এমুহূর্তে, বৈশ্বিক মহমোরি কোভিড-১৯, অন্য অনেককিছুর পাশাপাশি, সাক্ষরতা শিক্ষার পেডাগজি সম্পর্কিত পলিসি বা নীতি সম্পর্কে চলমান সংলাপ এবং বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। কোভিড-১৯ শুরুর আগে এক্ষেত্রে যে পার্থক্য ছিল মাহমারী শুরু হওয়ার পর থেকে তা আরও জোরালো হয়েছে। খুব স্বল্প সাক্ষরতার দক্ষতাসম্পন্ন বা যাদের সাক্ষরতার কোন দক্ষতা ছিলই না সেই যুবক ও বয়স্কদের শিখন প্রক্রিয়াকে কোভিড-১৯ নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করছে। ফলে, সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনপ্রয়াসী যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ এবং এক্ষেত্রের শিক্ষকগণও বহুমুখী অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। অতএব, এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি সামনে চলে আসছে তা হচ্ছে, কোভিড-১৯ বাংলাদেশের সাক্ষরতা শিক্ষক এবং শিখন ও শেখানোর উপর কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করছে? বৈশ্বিক মহমোরি কোভিড-১৯ এবং যুবক ও বয়স্ক সাক্ষরতা শিক্ষার পেডাগজির পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

জাতিসংঘ কর্তৃক আগস্ট ২০২০ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, বৈশ্বিক মহমোরি কোভিড-১৯ শিক্ষা ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছে, যার দ্বারা বিশ্বের সব মহাদেশের ১৯০টিরও বেশি দেশের প্রায় ১৬০ কোটি শিক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্কুল এবং অন্য শিক্ষা ক্ষেত্রগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশ্বের শিক্ষার্থী জনসংখ্যার শতকরা ৯৪ ভাগ এবং নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলোর শতকরা ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থীর উপর এর প্রভাব পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে আগে থেকেই বিদ্যমান বৈষম্য এই সংকটের কারণে উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সবচেয়ে দুর্বল শিশু, যুবক এবং বয়স্করা– যারা দরিদ্র বা গ্রাম এলাকায় বাস করে, মেয়েরা, শরণার্থী, অক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং বলপূর্বক স্থানচ্যুত ব্যক্তিবর্গের শিখন অব্যাহত রাখার সুযোগ কমে গিয়েছে; যা শিক্ষা ক্ষেত্রে শুধু মেয়ে এবং যুবতী নারীদের প্রবেশ ও ধারণ ক্ষমতার মধ্যে সীমিত নেই, বরঞ্চশিখনের ক্ষতি বর্তমান প্রজন্ম ছাড়িয়ে যাওয়া সহ দশকব্যাপী অগ্রগতি মুছে দেয়ার হুমকি সৃষ্টি করেছে।

জাতিসংঘ বলছে, বৈশ্বিক মহমোরির কারণে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত আরো প্রায় দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ শিক্ষার্থী ঝরে পড়তে পারে অথবা শুধু অর্থনৈতিক প্রভাবের ফলে পরবর্তী বছরে তাদের পক্ষে ভর্তি হওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। বাংলাদেশ এর থেকে আলাদা নয়। ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এটি অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর প্রত্যক্ষ এবং সবচেয়ে তাৎক্ষণিক প্রভাব হচ্ছে শিখন সুযোগের ক্ষতি। অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল জাতীয় সংসদে তাঁর এ বছরের বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, দেশের প্রাথমিক স্তরের এক কোটি সত্তর লক্ষ শিক্ষার্থীসহ দেশের তিন কোটি ষাট লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এখন বিদ্যালয়ের বাইরে। তিনি আরো বলেছেন যে, করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের কারণে সমগ্র দেশব্যাপী প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থীর নিয়মিত একাডেমিক পাঠক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তবে সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এই ক্ষতি কমানো তথা শিখন শেখানোর কৌশল অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে টেলিভিশন, বেতার, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের মধ্যে শিক্ষা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কারিকুলাম অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠ প্রচার করে আসছে। "আমার ঘরে আমার স্কুল" শীর্ষক এই অনুষ্ঠান প্রতিদিন সকাল ৯.০০ থেকে বেলা ১২.৩০টা পর্যন্ত প্রচার হয়ে থাকে। এই টেলিভিশন পাঠদান চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ইউটিউব চ্যানেলেও পাওয়া যায়। স্কুল বন্ধ থাকাকালে টিভি, বেতার, মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট প্লাটফরম ব্যবহারের মাধ্যমে ফলপ্রসূ দূরশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঘরে বসে শিক্ষার্থীদের শিখন অব্যাহত রাখা নিশ্চিত করতে সরকার ইউনিসেফ-এর সাথে কাজ করছে। এই সহায়তার অংশ হিসেবে ঘরে থেকে শিক্ষারত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বাবা-মা এবং শুশ্রুষাকারীদের ইউনিসেফ সমর্থন দিচ্ছে। সাক্ষরতার লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে করোনাকালের বিঘ্নবিপত্তি কাটিয়ে ওঠার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোও বিভিন্ন কৌশল ও কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

প্রফেসর ড. অরুণ কুমার গোস্বামী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, কর্তৃক প্রকাশিত 'ইনস্টিটিউশনালাইজেশন অব ডেমোক্র্যাসি ইন বাংলাদেশ' (২০১৯) গ্রন্থের লেখক।
সভাপতি, কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশন ফাউন্ডেশন (সিটিইএফ), বাংলাদেশ চ্যাপ্টার
সদস্যসচিব, বাংলাদেশ শিক্ষক ঐক্য পরিষদ; পরিচালক, সাউথ এশিয়ান স্টাডি সার্কেল
এবং সাবেক চেয়ারম্যান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১ম সংশোধিত উদ্দেশ্য ও অর্জন

শামীমুল হক পাভেল

প্রকল্পের পটভূমি :

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ প্রদানসহ দেশ হতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফোরামে অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়া বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা হবে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমান সাক্ষরতার হার ৭৪.৭ শতাংশ। দেশে বর্তমান নিরক্ষরতার হার ২৫.৩ শতাংশ। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ তাদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার জন্য সরকার মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) গ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪, জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ১৫-৪৫ বছর বয়সের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে প্রথম ধাপে দেশের ৬৩টি জেলার ১৩৪টি উপজেলায় ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে শিখন কেন্দ্রে পাঠদান কার্যক্রম শুরু করে। এটি জুন ২০১৯ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম ধাপে ২৩৫৯৪৪১ জন নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপে ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী ও পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। প্রকল্পটি সরকারি সংস্থার তত্ত্বাবধানে এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নির্বাচিত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ :

১. দেশের ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী মোট ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে জীবনদক্ষতা (life skills) ভিত্তিক মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশত বার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' (মার্চ ২০২০–মার্চ ২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার মধ্য থেকে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা;

২. জাতীয় (সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা) ও আন্তর্জাতিক (SDG4) পর্যায়ের অঙ্গীকার পূরণ এবং দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখা;

৩. জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি ২০০৬-এর আলোকে এবং ঋউএ৪ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা;

প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠী : দেশের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষ যাদের বয়স ১৫-৪৫ বছর।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১ম সংশোধিত'র সংক্ষিপ্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	বিষয়/আইটেম	সংখ্যা/পরিমান	মন্তব্য
১.	মোট কেন্দ্র সংখ্যা	৭৫,০০০ (পচাঁত্তর হাজার)	প্রতি কেন্দ্রে দুই শিফ্ট (১টি নারী ও ১টি পুরুষ)
২.	শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৫-৪৫ বছর বয়সী)	৪৫ লক্ষ	প্রতি কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ৬০ জন (৩০ পুরুষ+৩০ নারী)
৩.	শিক্ষকের সংখ্যা	৭৫,০০০×২ শিফ্ট = ১,৫০,০০০ জন	প্রতি কেন্দ্রে দু'জন শিক্ষক (১জন পুরুষ ও ১জন নারী)
৪.	সুপারভাইজারের সংখ্যা	৩,৭৫০ জন	প্রতি ২০টি শিখনকেন্দের জন্য একজন
৫.	কোর্সের ব্যাপ্তি	৬ মাস	-
৬.	ফেইজ সংখ্যা	২টি	-
৭.	প্রতি উপজেলায় গড় কেন্দ্র সংখ্যা	৩০০টি	-

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন কৌশল :

১. **এনজিও নির্বাচন ও চুক্তি সম্পাদন :** সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও, নির্বাচন ও চুক্তি সম্পাদন।

জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার শিক্ষক
ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন

২. **বেইজলাইন জরিপ (Serevey) ও শিক্ষার্থী নির্বাচন :** কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী এনজিও জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী পরিচালক, উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ১৫-৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষরদের বেইজলাইন জরিপ পরিচালনা করা হয়। বেইজলাইন জরিপের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়।

৩. **শিখনকেন্দ্র স্থাপন :** বেইজলাইন সার্ভে অনুযায়ী নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ঘনত্বের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ ও সহজে আসতে পারে এমন স্থানে শিখনকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

৪. **শিক্ষার্থী নির্বাচন ও পাঠদান :** বেইজলাইন জরিপের মাধ্যমে প্রণীত নিরক্ষরের তালিকা হতে প্রতি শিফ্টের জন্য আগ্রহী ৩০ জনকে শিক্ষার্থী হিসেবে নির্বাচন ও তালিকাভুক্তির মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। সাধারণত একই কেন্দ্রে পুরুষ ও নারীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পাঠদান অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি শিখনকেন্দ্রে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকে (পুরুষ শিফ্টের জন্য পুরুষ– শিক্ষক এবং নারী শিফ্টের জন্য নারী শিক্ষক)। সাধারণত প্রতিটি শিখনকেন্দ্রে দিনের বেলায় পাঠদান করা হয়। প্রতিদিনের পাঠদানকাল কমপক্ষে ২ (দুই) ঘণ্টা এবং কোর্সের ব্যাপ্তি ৬ (ছয়) মাস। শুক্রবার অথবা অন্য কোন সুবিধাতো দিনে সাপ্তাহিক বন্ধ থাকে। সরকারি ছুটির দিন শিখকেন্দ্র বন্ধ থাকবে।

৫. **শিখনকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক :** সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপিত শিখনকেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অন্য শিখনকেন্দ্রের সিনিয়র শিক্ষক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেন। সাধারণত পুরুষ শিফ্টের শিক্ষক সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হয়।

৬. **কেন্দ্র পরিচালনা ব্যয় :** প্রতি মাসে প্রতি কেন্দ্রের পরিচালনা ব্যয় ৩০০.০০ (তিনশত) টাকা। মাসিক মোট পরিচালনা ব্যয়ের ৫০% (১৫০.০০ টাকা) কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সংস্থা সার্ভিস চার্জ হিসেবে প্রাপ্য হয়। অবশিষ্ট ৫০% (১৫০.০০ টাকা) সিএমসি সভা ও কেন্দ্রের অন্যান্য ব্যয় মেটানো হয়।

৭. **সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ (Social mobilization) :** কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমেই সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পাওয়া সম্ভব হয়। এ কারণে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পে (৬৪ জেলা) সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের বিধান রাখা হয়েছে।

৮. **শিক্ষক নিয়োগ ও সম্মানী প্রদান :** নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিটি শিখনকেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে এসএসসি পাশ ১ জন পুরুষ ও ১ জন নারী– শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। সফলভাবে মৌলিক শিক্ষা কোর্স সম্পন্নকারী প্রতিজন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক প্রতিমাসে ৮০.০০ টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হন। এ হিসেবে প্রতিমাসে ৩০ জন শিক্ষার্থীর পাঠদানের জন্য একজন শিক্ষক প্রতিমাসে সর্বোচ্চ ২৪০০.০০ টাকা সম্মানী ভাতা পায়।

৯. **সুপারভাইজার নিয়োগ ও সম্মানী প্রদান :** নির্ধারিত যোগ্যতা ও শর্তসাপেক্ষে কর্মসূচি পরিবীক্ষণের জন্য প্রতি ২০টি শিখনকেন্দ্রের জন্য কমপক্ষে এইচএসসি পাশ ১ জন সুপারভাইজার নিয়োগ দেয়া হয়। সুপারভাইজারের মাসিক সম্মানী ভাতা ২০০০.০০ টাকা এবং যাতায়াত ভাতা ৫০০.০০ টাকা।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়
শিক্ষক সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন।

১০. **কোর ট্রেইনার তালিকাভুক্তকরণ :** মূল প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাভিত্তিক সরকারি/বেসরকারি সংস্থা/ বিশ্ববিদ্যালয়/বেসরকারি সংস্থার আগ্রহী কর্মকর্তা/ব্যক্তির সমন্বয়ে ২০ জন মূল প্রশিক্ষক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১১. **মাস্টার ট্রেইনার তালিকাভুক্তকরণ :** কেন্দ্র শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় দক্ষ ও অভিজ্ঞদের (সরকারি/বেসরকারি সংস্থায় কর্মকর্তা/ব্যক্তি) মধ্য থেকে প্রতি জেলার জন্য কম-বেশী ২০ জনকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

১২. **সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ও প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তা, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক, উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার, মাস্টার ট্রেনার, সুপারভাইজার এবং শিক্ষকদের সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পদাধিকারীদের (incumbents) দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষণের বিষয় ও সময়কাল ভিন্ন ভিন্ন হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদধারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতায়নের জন্য তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মনোভাবের পরিবর্তন করাই প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য।

১৩. **পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :** যে কোনো প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ভূমিকা অনস্বীকার্য। পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের ভুলত্রুটি ও সমস্যা চিহ্নিত করণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে, মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কীনা তা জানা সম্ভব হয়। তাছাড়া, মূল্যায়নের ফলাফল প্রকল্পের সার্বিক কর্মকাণ্ড ফলপ্রসূ এবং পরবর্তীকালে একই ধরণের প্রকল্প গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। উল্লিখিত কারণে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পে (৬৪ জেলা) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয় শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মহোদয় শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুভ উদ্বোধন করেন ।

পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ এর দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/প্রতিষ্ঠান :

১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ;
২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কর্মকর্তাবৃন্দ;
৩. প্রকল্প কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ;
৪. জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালকবৃন্দ;
৫. উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসারগণ;
৬. জেলা প্রশাসক ও জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ;
৭. উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির সদস্যবৃন্দ;
৮. কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ইউনিয়ন সাক্ষরতা কমিটির সদস্যগণ;
৯. প্রকল্প বাস্তবায়নকারী বেসরকারি (এনজিও) সংস্থা;
১০. কর্মসূচি পরিবীক্ষণের জন্য নিয়োজিত সুপারভাইজারগণ;
১১. সংশ্লিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক; এবং
১২. প্রকল্পের যেকোন অংশীজন যেমন- কমিউনিটি লিডার, এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সমাজসেবকগণ।

মূল্যায়ন :

(১) **কেন্দ্র শিক্ষক কর্তৃক মূল্যায়ন :** আমদের চেতনা ১ম ও ২য় খণ্ডে ১২টি করে পুনরাবৃত্তি ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। পুনরাবৃত্তি ক্লাসে কেন্দ্র শিক্ষক সকল শিক্ষার্থীর পাঠ অর্জন/অগ্রগতি যাচাই করবেন, যাচাইয়ের ভিত্তিতে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নির্ধারিত রেজিষ্টারে মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করে।

(২) পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক মূল্যায়ন : পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ কর্মকর্তাগণ কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় শিক্ষার্থীদের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করে ফলাফল কেন্দ্রের পরিদর্শন বহিতে লিপিবদ্ধ করেন।

(৩) অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি (থার্ড পার্টি) দ্বারা শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা দক্ষতা যাচাই/মূল্যায়ন :

ক. অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি (থার্ড পার্টি) নিয়োগ: শিক্ষার্থীদের পাঠ অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য এক বা একাধিক থার্ড পার্টি নিয়োগ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ইউনিট বিধি মোতাবেক (ডিপিপি অনুযায়ি) থার্ড পার্টি নিয়োগ করে।

খ. এসেসমেন্ট এজেন্সি (থার্ড পার্টি) কর্তৃক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া:

১. শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতা দক্ষতা অ্যাসেসমেন্ট/মূলায়ন করার জন্য এক বা একাধিক এজেন্সি নিয়োগ করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি (থার্ড পার্টি) কর্তৃক শিক্ষার্থীদেরকে দুই বার মূল্যায়ন করা হয়। প্রথমবার তিন মাস অন্তর (mid-term) এবং দ্বিতীয়বার কোর্স সমাপনান্তে;

২. অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সির (থার্ড পার্টি) মূল্যায়ন কার্যক্রম তদারকীর জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি উপজেলা এসেসমেন্ট কমিটি ;

৩. মধ্যবর্তী যাচাই/মূল্যায়নের সময় অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সির অ্যাসেসরগণ কেন্দ্রের ব্ল্যাকবোর্ডে প্রশ্ন লিখে দিবেন এবং শিক্ষার্থীগণ তাদের অনুশীলন খাতায় উত্তর লিখবেন;

৪. অ্যাসেসরগণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উত্তর পত্র যাচাই করে নম্বর প্রদানপূর্বক কৃতকার্য (Qualified) ও অকৃতকার্য (disqualified) হিসেবে মন্তব্য প্রদান করবেন;

৫. চূড়ান্ত মূল্যায়নের সময় উত্তরপত্রসহ (answer script) ছাপানো প্রশ্ন ব্যবহার;

৬. মধ্যবর্তী মূল্যায়নের অনুরূপ পদ্ধতিতে সমাপনী মূল্যায়নের পর যাচাই ও নম্বর প্রদান;

৭. সফলভাবে কৃতকার্য শিক্ষার্থীদের উপজেলা অ্যাসেসমেন্ট কমিটি ও অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি কর্তৃক যৌথভাবে সনদ প্রদান করা হয়; এবং

৮. অ্যাসেসমেন্ট এজেন্সি (থার্ড পার্টি) যথাসময়ে প্রকল্প পরিচালক, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করবে।

গ. চূড়ান্ত মূল্যায়নে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের পুনঃমূল্যায়ন ঃ চূড়ান্ত মূল্যায়নে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র শিক্ষক কর্তৃক অতিরিক্ত সময় (অনধিক ২ মাস) পাঠদানের পর তাদের পুনঃমূল্যায়ন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) বা প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি)'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী থার্ড পার্টি দ্বারা অথবা উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটির ব্যবস্থাপনায় উপজেলা অ্যাসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক এসব শিক্ষার্থীদের পুনঃমূল্যায়ন করা হবে।

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কমিটি

মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিখনকেন্দ্র থেকে জেলা পর্যায় পর্যন্ত মোট ৫টি কমিটি রয়েছে। যথা-

১. **জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (Destract Non-Formal Education committee) :** জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জেলা পর্যায়ে জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (DNFEC) রয়েছে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ২২ জন। সহকারী পরিচালক, জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

২. **উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (Upazila Non-Formal Education committee) :** উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি (unfec) রয়েছে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ২১ জন। উপজেলা প্রোগ্রাম অফিসার, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

৩. **উপজেলা মূল্যায়ন (Assessment Committee) কমিটি :** শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মূলায়ন কমিটি রয়েছে। উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা মূল্যায়ন কমিটি গঠন করবে।

৪) **ইউনিয়ন সাক্ষরতা কমিটি (Union Literacy |Committee) :** ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ইউনিয়ন সাক্ষরতা কমিটি (ulc) রয়েছে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পের (৬৪ জেলা) ১ জন সুপারভাইজার এ কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করে।

৫) **কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (Centre Management Committee) :** শিখন কেন্দ্রগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রতিটি শিখন কেন্দ্রে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) রয়েছে। শিখন কেন্দ্রের সিনিয়র শিক্ষক এ কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

প্রকল্পের বর্তমান বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(ক) প্রথম ধাপের কার্যক্রম :

- বাংলাদেশের ৬৩টি জেলার ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩৫৯৪৪১ জন নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের শিখন কেন্দ্রে পাঠদান (৬ মাস) কার্যক্রম ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ শুরু এবং ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন করা হয়েছে।

(খ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপের কার্যক্রম :

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এর নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ অনুযায়ি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী 'মুজিব বর্ষ' উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে (১৫-৪৫ বছর বয়সী) মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন।
- কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলার মাঠ পর্যায়ে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য ১১৪টি বাস্তবায়নকারী এনজিও'র সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- এ লক্ষ্যে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) এর মাঠ পর্যায়ের কর্মসূচিভুক্ত উপজে-লাসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে সম্পৃক্তকরণের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের স্বাক্ষরে তাঁদেরকে আধাসরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় ধাপে বাংলাদেশের ৬০টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় ২২৬০৩৪০ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষদের বেইজলাইন সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে। জরিপকৃত নিরক্ষর নারী-পু-রুষদের মধ্য থেকে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কমিটি ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের জন্য অনুমোদন প্রদান করেছে।
- কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলায় ৩৫০০০ শিখন কেন্দ্রের (২ শিফ্‌ট) স্থান নির্বাচন করা হয়েছে।
- কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলায় ১৭৫জন সুপারভাইজার ও ৭০০০০ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা হয়েছে।
- দ্বিতীয় ধাপের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ৪৩০০৭১০ খানা প্রাইমার (আমাদের চেতনা ১ ও ২), শিক্ষক সহায়িকা, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও ফ্লিপ চার্ট মুদ্রণ এবং উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- কর্মসূচিভুক্ত ১১৪টি উপজেলাতে ১১২০টি সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের সভা সমাবেশ করা হবে। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের পরিস্থিতির উন্নতি হলে মাঠ পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের সভা সমাবেশ করা হবে।

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতা প্রদানের জন্য ০১ এপ্রিল ২০২০ হতে একযোগে ৩৫০০০ শিখন কেন্দ্র (২ শিফ্‌ট) চালু করার সিদ্ধান্ত থাকলেও করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে সম্ভব হয়নি। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিলে সেপ্টেম্বর ২০২০ মাস থেকে শিখন কেন্দ্র চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।
- দ্বিতীয় ধাপের ১১৪টি উপজেলার শিক্ষার্থীদের মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য এসেসমেন্ট এজেন্সি (third party) নিয়োগের লক্ষ্যে আগ্রহ ব্যক্তকরণ প্রস্তাব (expression of interest) মূল্যায়ন পূর্বক সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত এজেন্সিকে ২৪ জুন ২০২০ Request for Proposal প্রদান করা হয়েছে।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১ম সংশোধিত বাস্তবায়ন শেষে যা অর্জিত হবে :

১. ১৫-৪৫ বছর বয়সের ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষ মৌলিক সাক্ষরতা অর্জন করবে;
২. এর মাধ্যমে তারা জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে আলোকিত মানুষ হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে;
৩. চর, হাওর, দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বসবাসকারী সুবিধাবঞ্চিত মানুষ এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসিরা সাক্ষরতা লাভ করবে;
৪. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রেক্ষাপটে প্রণীত 'জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২' এবং 'সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ নিশ্চিত হবে;
৫. জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নীতি-২০০৬, জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০১০ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন-২০১৪ বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে;
৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিয়োজিত সকল পর্যায়ের সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জিত হবে; এবং
৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং সরকার, এনজিও ও সামাজিক সহযোগিতা নিশ্চিত হবে।

উপসংহার : বাংলাদেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের মাধ্যমে তাদের বর্তমান পেশায় অধিক কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপে, একদিকে তাদের শিক্ষিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, তারা উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখাতে পারবে। তাহলে ক্ষুদ্রায়তনের এই দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী পরিণত হবে দক্ষ জনসম্পদে। এটি আমাদের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষায় বিনিয়োগে নতুন নতুন প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। এর মধ্যে বিদ্যালয় হতে ঝরেপড়া ও শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত ৮-১৪ বছর বয়সী শিশুদের জন্য 'Out of School Children' প্রকল্প ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (Non-Formal Education Development Programme) উল্লেখযোগ্য। তবে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি অবশ্যই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। আর এজন্য প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষা, তথা কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষা। দেশে গড়ে তুলতে হবে উৎপাদমুখী ও শিল্পভিত্তিক অর্থনীতি। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান (ক্ষুদ্র, মাঝারি ও ভারি শিল্প)। আর তা'হলেই জীবিকার প্রয়োজনে মানুষ শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হবে। আদিকাল থেকেই মানুষের সকল ধরনের শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য অবশ্যই অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ। নীতি-আদর্শ, আইন-কানুন, ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে সুস্থ জীবন যাপনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষা লাভ করার পর যখন কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না, তখন অসহিষ্ণুতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

কেননা, বেকারত্বের হতাশা থেকে মুক্তিলাভের আশায় মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে। আর এই সুযোগে এক শ্রেণির স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সহজ সরল দরিদ্র মানুষগুলো নীতি নৈতিকতার অপব্যাখ্যা দিয়ে অন্ধকার জগতের দিকে নিয়ে যায়। যা সমাজ তথা জাতির জন্য ভয়ংকর পরিণতি বয়ে আনে। তাই আমাদের শিক্ষা হোক কর্মমুখী, যার মাধ্যমে ২০৪১ সালে উন্নত ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

[লেখক : প্রকল্প পরিচালক, মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১ম সংশোধিত, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়]

কোভিড-১৯ সংকটে বাংলাদেশে সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা

মোঃ আবু তালেব মিয়া

ভূমিকা : ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং জাতীয় পর্যায়ে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা এবং এর টেকসই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা অপরিহার্য। সাক্ষরতাজ্ঞান অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মৌলিক শিক্ষা। কোভিডের অদৃশ্য আক্রমণে সারাবিশ্বের মানুষ ক্ষতবিক্ষত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর অসংখ্য মানুষ প্রতিদিনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। কেউ মারা গেলে সরকারি ব্যবস্থায় সৎকার করা হচ্ছে আপন আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত লাশ দেখার সুযোগ ও সৎকারে অংশগ্রহণ করতে পারে না। কী নির্মম ও অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু যাদের পরিবারে এমন হয়েছে তাদের অনুশোচনা ও দুঃখ দেখার সুযোগ অনেকের হয়েছে। পঞ্জিকা বর্ষে জানুয়ারি থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শ্রেণিপাঠে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে। করোনার ছোবল থেকে মুক্ত থাকার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার রুটিন করা হলেও বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে ১৭ মার্চ থেকে ৩রা অক্টোবর সকল শিক্ষালয়ের শ্রেণিপাঠ এবং সর্বস্তরের পরীক্ষা বন্ধ করা হয়। সকল সেক্টরের ক্ষতি হলেও শিক্ষা সেক্টরের ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশী। শিক্ষা সেক্টরের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ শিক্ষার সাথে জড়িত শিক্ষাবিদগণ সিলেবাস ছোট করা বা পরীক্ষা কোন পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য ভালো হবে তার চিন্তা ও পরিকল্পনা বিভিন্ন মিডিয়-ার মাধ্যমে অবহিত করছেন।

সরকার কর্তৃক সাক্ষরতার বিভিন্ন অভিযান : প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়েদের জাতীয় শিক্ষা নীতির (২০১০) আলোকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যেক শিশুকে তার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক ও নান্দনিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করাই প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন, বাধ্যতামূলক, গুণগত ও মানসম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কিছু উল্লেখযোগ্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মহান স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিক্ষার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের সংবিধান প্রণীত হয়। এই সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মৌলিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় সাক্ষর জ্ঞান। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা উত্তর জাতির শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের শুভ সূচনা করেছিলেন। সাক্ষরতা বিস্তারে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ফোরামের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে সাক্ষরতাদিবস পালিত হয়। এ প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালে ৩৬,৬১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়-করণ করা হয় এবং কর্মরত ১,৫৭,৭২৪ জন শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকুরি সরকারিকরণ করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২০১৩ সালে দেশের ২৬,১৯৩টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ এবং এসব বিদ্যালয়ে কর্মরত ১,০৩,৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি সরকারিকরণের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রযাত্রাকে একধাপ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে ড. কুদরত-ই খুদার নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কমিশনের রিপোর্টে

নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নামে একটি অধ্যায়ে সাক্ষরতা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কোভিড ১৯ এর প্রভাবে বিশ্ব ও বাংলাদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি : বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাঙ্গনে শ্রেণিপাঠ থেকে বিরত থাকলেও তাদের অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে না। কারণ তাদের বিকল্প শিক্ষা গহণের জন্য ইন্টারনেট, ই-লার্নিং, ই-লাইব্রেরি এ্যাকসেস, ফেইসবুক, ইউটিউব, দূরশিখণ অর্থাৎ অনলাইনের সব ধরনের সুযোগ আছে। আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামান্য সুযোগ থাকলেও স্কুল, কলেজ, মাদরাসা, প্রাথমিকস্তরের শিক্ষার্থী যেমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ী ও এরূপ বিদ্যালয়ে অনলাইন পড়াশোনা নাই বললেই চলে। করোনাভাইরাস মহামারীর হুমকিতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় চার কোটি শিক্ষার্থী। সরকারের পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেই যে পড়াশোনা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হবে তা ঠিক নয়। সরকারি নির্দেশনায় প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারচুয়াল ক্লাশের উদ্যোগ ইতোমধ্যে কিয়দপরিমাণে চালু হয়েছে ।

সাক্ষরতা ও টেকসই শিক্ষা : আমরা জানি সাক্ষর জ্ঞানঅর্জনকে ধরে রাখার জন্য টেকসই শিক্ষার ফলে মানবসম্পদের উন্নয়ন ঘটে। একজন মানুষকে শিক্ষিত, সচেতন ও কর্মদক্ষ তথা উৎপাদনশীল নাগরিকে পরিণত করার মাধ্যমেই মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব। মানবসম্পদে পরিণত করার জন্যই মৌলিক শিক্ষার পাশাপাশি অব্যাহত শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। আলোকিত ও উৎপাদনশীল জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন দেশে সাক্ষরতার প্রসার ঘটানো তথা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। ইতোমধ্যে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রাথমিক স্তরে প্রায় শতভাগ শিশুদের ভর্তির সফলতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ১ম-৫ম শ্রেণিতে পৌছানোর আগেই শিক্ষার্থীদের বিপুল অংশ ঝরে পড়ে। যে সকল শিশু স্কুলে ভর্তি হতে পারে না তারা এবং ঝরেপড়া শিশুরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বল্প সময়ের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমবাজারে দক্ষতার সাথে কাজ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। এ লক্ষ্যেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দ ও পারগ ক্ষমতার সাথে মিল রেখে ট্রেড নির্বাচন করে আসছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশব্যাপী সাক্ষরতা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা সফল হলে জনসংখ্যাধিক্যের দেশ না হয়ে জনসম্পদের দেশ হিসেবে বিশ্বে বাংলাদেশ সমাদৃত হবে।

করোনা পরিস্থিতিতে সাক্ষরতা প্রদানের বিকল্প কৌশল

১. বাংলাদেশে বহু আগে থেকেই এসএসসি ও এইচএসসি লেভেলে বেতার ও টেলিভিশনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে মাসে একবার পাঠদানের জন্য খুব ভালোমানের শিক্ষক দিয়ে উপস্থাপন করানো হতো। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হবার পরে বেতার এবং টিভিতে অনেক সুন্দরভাবে দক্ষ শিক্ষকের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বেতার ও টিভির সামনে পাঠগ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সেটি আবার চালু করা যেতে পারে।

২. **শিক্ষাকেন্দ্র ইন্টারনেটের আওতায় আনয়ন :** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে ইন্টারনেটের সহায়তায় দূর শিখন প্রোগ্রামের আওতায় আনা প্রয়োজন। করোনার কারণে এ উন্নত দেশসমূহের বেশী ঘন বসতি জায়গাগুলোতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেসব দেশে অন্যান্য কার্যক্রমের মতো শিক্ষা ব্যবস্থাকেও অনলাইনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদেরকে অনলাইনে কীভাবে আন্তরিকতার সাথে পাঠ উপস্থাপন করতে হবে তা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৩. **ই-লার্নিং কার্যক্রম পরিচালনা :** ই-লার্নিং এর অর্থ হচ্ছে ইন্টারনেট থেকে শিক্ষা নেয়া। ই-লার্নিং ইলেকট্রনিক লাইন বা অনলাইন হিসেবেও বিবেচিত হয়। ফেস বুক, ইউটিউব, ঝুম, ট্যুইটার, কনফারেন্সি, মোবাইল অ্যাপস ব্যবহার করেই লার্নিংয়ের ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই চালু হয়েছে। আমাদের দেশে ই-লার্নিং কার্যক্রম সীমিত পর্যায়ে আছে।

৪. **বিনামূল্যে অনলাইন শিক্ষায় ইন্টারনেটের সুযোগ :** বিদ্যুৎ সংযোগ প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছানো হলে কম্পিউটার ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পর ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ ঘটে। মৌলিক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের জন্য কম্পিউটার ও স্মার্ট ফোন কেনা দুঃসাধ্য।

৫. **শিক্ষাক্রম সংক্ষিপ্তকরণ :** শিক্ষাক্রমের অংশ হচ্ছে সিলেবাস। সিলেবাসকে বেশ ছোট করা দরকার। করোনা ভাইরাসের কারণে গোটা শিক্ষাক্রমকে ঢেলে সাজাতে হবে। স্বল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শিখন-শেখানোর কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষক/সহায়ক সিলেবাস শেষ করতে হবে।

৬. **ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি :** ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে পাঠদানের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহজ। স্লাইড তৈরি করার মতো দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হলেই বিভিন্ন ছবি অ্যানিমেশন দ্বারা শিক্ষক চুম্বক শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সামনে দৃষ্টিনন্দন স্লাইড উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হবে।

৭. **গৃহকেন্দ্রিক শিক্ষা দান :** ঘরে বসে শিখি। বেতার, টিভি সকল শিক্ষার্থীর জন্য শতভাগ সফল পাওয়া যাবে না। মৌলিক শিক্ষাদানে শিক্ষক/সহায়ক বাড়িতে গিয়েও শিক্ষার্থীদের অল্পসময়ের জন্য পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮. **শিক্ষকদের স্বল্প সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা :** ডিজিটাল কন্টেন্ট, ফেসবুক, ঝুম, অ্যানিমেশন তৈরি করার জন্য শ্রেণি শিক্ষককে স্বল্প পরিসরে কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণের আয়োজন করবেন। ইউটিউব, ঝুম, মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে গ্রুপে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা দরকার।

৯. **বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা :** সমাজে সব শিশুই পরিপূর্ণ সুস্থতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বিশেষ অসুবিধাগ্রস্ত শিশু শারীরিক ও মানসিক ক্ষেত্রে লক্ষ রেখে আদর ও যত্ন করে শিক্ষককে পাঠদান করতে হবে। এরূপ শিশুদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার।

১০. **বেসরকারি সংস্থার সাথে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা :** সরকারের পাশাপাশি অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয় কারণ তাদের অভিজ্ঞতা ও শিখন পদ্ধতি দেখে অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যাবে। অধুনা প্রায় প্রতিটি দেশেই পিপিপি এর মাধ্যমে অনেক কাজ সম্পাদিত হয়।.

১১. **বাজেট বৃদ্ধিকরণ :** যেহেতু বিকল্প শিক্ষা আয়োজনের সাথে সাথে খরচ বেড়ে যাবে এ জন্য সরকারকে শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি করার উদ্যোগী হতে হবে।

উপসংহার : সাক্ষরতা প্রদানে শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন, ফেইসবুক, জুম ইত্যাদির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাঠদানের ব্যবস্থা করা হলে দেশের সাক্ষরতার হার অকল্পনীয়ভাবে এগিয়ে যাবে। স্বাক্ষরতা অর্জনে রাষ্ট্র ও সমাজের এলিটদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় শিক্ষাবিদের ভূমিকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মধ্যে পড়েন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাননীয় সাংসদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ, উপাচার্য, জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ইউপি প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, ইউএনও, অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষাপ্রশাসক, জেলা এনএফই সহকারী পরিচালক, এনজিও, শিক্ষাঅংশীজন সম্মানিত শ্রেণিশিক্ষক এবং অভিভাবকসহ শিক্ষার্থীরা। তাঁদেরকেই বিশাল জনগোষ্ঠিকে অনুপ্রেরণা দিতে হবে। শ্রেণি পাঠদানের সময় না আসা পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিকল্প শিক্ষা গ্রহণ ও প্রদানের

জন্য আগ্রহী করতে হবে। শিক্ষাবিদরা করোনার সময়ে উন্নত দেশের পাঠদানের কৌশলসমূহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বোঝানের চেষ্টা করবেন। সমাজের সব বাবা-মা সমান বোঝে না। বাবা-মা যেন তাদের সন্তানদের বিকল্প শিক্ষার মাধ্যম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন সেইভাবে শিক্ষাবিদরা ভূমিকা পালন করবেন।

শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের সম্পদ। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দ ও পারগ ক্ষমতার সাথে মিল রেখে ট্রেড নির্বাচন করে আসছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশব্যাপী সাক্ষরতা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অব্যাহত রাখা সম্ভব হলে বাংলাদেশকে জনসম্পদে দেশের পরিণত করা যাবে। জনমিতি অনুসারে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে কর্মক্ষম মানুষের হার সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে স্বল্পসময়ের মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা সম্ভব ।

প্রফেসর মো: আবু তালেব মিয়া
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, এমএম কলেজ, যশোর
সাবেক উপপরিচালক, পরিকল্পনা, বিএনএফই

করোনাকাল সময়ে সাক্ষরতা শিক্ষা

মুর্শিদা বেগম

করোনা ভাইরাস পাল্টে দিয়েছে সবার জীবনের বাস্তবতা। মাত্র ছ'মাস পূর্বেও আমাদের এই পৃথিবী ছিল ব্যস্ত ও প্রাণচঞ্চল। প্রতিদিনের সকাল শুরু হতো ব্যস্ততা দিয়ে। এমন জীবনে অভ্যস্ত আমরা তখন পর্যন্ত ভাবতেও পারিনি সামনের দিনগুলোতে কী হতে যাচ্ছে! কোভিড-১৯-এর আক্রমণে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ এ দুর্যোগে পুরো পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষ গৃহবন্দী জীবনযাপন করছে। সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল অফিস-আদালত, শিল্প, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ প্রায় সকল খাত। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৭ মার্চ থেকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে যা সর্বশেষ আদেশ অনুযায়ী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত বহাল থাকবে। এমন বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে "কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা" শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০ উদযাপিত হতে চলেছে।

করোনাভাইরাসের প্রভাবে পুরো বিশ্বে আজ যে স্থবিরতা নেমে এসেছে তা থেকে রেহাই পায়নি শিক্ষাব্যবস্থাও। উন্নত দেশগুলোতে অনলাইন মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কার্যক্রম এগিয়ে নিলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থায় অধিকতর নির্ভরশীল হওয়ায় এই স্থবিরতা জেঁকে বসেছে প্রকটরূপে। যার ফলে সেশনজটের মতো ভয়াবহ ফলাফলের আশংকা করছেন বিশেষজ্ঞরা। দীর্ঘ এই লকডাউন চলাকালে ও লকডাউন পরবর্তীকালে এবং করোনাকাল দীর্ঘায়িত হলে সাক্ষরতা কর্মসূচি সচল করার জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা নিয়েই আমাদের আজকের এই আয়োজন।

বিসিএস (BBS)-এর সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে বয়স্ক (১৫+) সাক্ষরতার হার ৭৪.৭% (Sample Vital Registration-2019) অর্থাৎ এখনও ২৫.৩% লোক নিরক্ষর। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন শতভাগ সাক্ষরতা। আর সেই লক্ষ্য অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ১৯৯১ সাল থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তত্ত্বাবধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে আমাদের সফলতাও আশাব্যঞ্জক।

প্রাথমিক শিক্ষায় যুগান্তকারী সাফল্য অর্জন সত্ত্বেও বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৭.৭৪% অর্থাৎ ২.২৬% বিদ্যালয় বহির্ভূত এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর পূর্বেই ঝরে পড়ছে ১৭.৯০% শিক্ষার্থী (Annual Primary School Census APSC-2019)। প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ২০.১৬% (২.২৬%+১৭.৯০%) শিশুকে পুনরায় শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা অত্যাবশ্যক বিবেচনায় বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার পিইডিপি-৪-এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫ এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সী বিদ্যালয় বহির্ভূত ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ইতোমধ্যে পাইলট কর্মসূচি হিসেবে ৬টি জেলায়– ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১০০,০০০ (এক লক্ষ) শিশুর শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অবশিষ্ট ৯০০,০০০ (নয় লক্ষ) বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুর শিখন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বর্তমান করোনাভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে চলমান ছুটিকালে সময়ে ৬ জেলায় চলমান সেকেন্ডচান্স এডুকেশন পাইলট কর্মসূচির আওতাধীন শিক্ষার্থী কর্তৃক 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' এবং ইউটিউবে প্রচারিত প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচি 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠান অনুসরণের মাধ্যমে লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ ও ফলো-আপ করণের লক্ষ্যে শিক্ষকগণও নিয়মিত এ

সকল ক্লাস অনুসরণ করছেন। এছাড়াও, বিশেষায়িত সংস্থার টিএ টীমের মনিটরিং কর্মকর্তাগণ 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করছেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মনিটরিং কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত জুলাই ২০২০-মাসের মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৬টি জেলার সমন্বিত প্রতিবেদন হতে প্রতীয়মান হয় যে, সেকেন্ডচান্স এডুকেশন পাইলট কর্মসূচির শতকরা ৪৮.২১ ভাগ শিক্ষার্থীর বাড়িতে টেলিভিশন দেখার সুবিধা আছে এবং গড়ে শতকরা ৪০.১১ ভাগ শিক্ষার্থী 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, গাইবান্ধা, সিলেট, ঢাকা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার ২২১৬ জন মেয়ে এবং ২০২৮ জন ছেলে সহ মোট ৪২৪৪ জন শিক্ষার্থী বাড়িতে টেলিভিশন দেখার সুবিধা না থাকলেও তারা সুপারভাইজার/শিক্ষক/অভিভাবকদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করে ইউটিউবে নিয়মিত 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠান অনুসরণ করে থাকে।

উল্লেখ্য, 'ঘরে বসে শিখি' অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক দূরত্ব রক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক মোবাইল ফোন ও অনলাইন ব্যবহার করে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী, সুপারভাইজার এবং শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত সিলেবাস অনুসরণপূর্বক সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিওতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সম্প্রচারিত পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত চলমান 'ঘরে বসে শিখি' অনলাইন পাঠদান উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিকে একই পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হচ্ছে বিধায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোকে আলাদাভাবে কোন অবকাঠামো ও ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করতে হচ্ছে না।

অপরদিকে সরকার ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার পূরণের নিমিত্ত "নিরক্ষরতা দূরীকরণের" জন্য নানামূখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এর মধ্যে "মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)" অন্যতম। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৫৯,৪৪১ (তেইশ লক্ষ ঊনষাট হাজার চার শত একচল্লিশ) জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ১১৪টি উপজেলায় ৩৫,০০০টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১,০০,০০০ (একুশ লক্ষ) জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে অর্থাৎ মুজিব বর্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা থাকলেও দূর্ভাগ্যবশত অদৃশ্য কোভিডের নির্মম থাবায় আমাদের লক্ষ্য অর্জন খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। বয়স্কদের সাক্ষরতা প্রদান কার্যক্রমে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মূলত চেতনা-০১ ও চেতনা ০২ বই দুটো ব্যবহার করা হয়। বয়স্ক নিরক্ষরদের পাঠদানে এই বইগুলি খুবই কার্যকর যা তাদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। করোনাকালে সময়ে অনলাইন সাক্ষরতার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো সম্পূর্ণভাবে প্রকল্প নির্ভর এবং এখনও কোন স্থায়ী কাঠামো গড়ে উঠেনি। নেই কোন স্থায়ী উপানুষ্ঠানিক শিখন কেন্দ্র। শিক্ষক/শিক্ষিকা, সুপার ভাইজারসহ সকল কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে প্রকল্প সময়ের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে। তাই স্থায়ী অবকাঠামোবিহীন উপানুষ্ঠানিক শিখনকেন্দ্রসমূহে অনলাইন সাক্ষরতা প্রদানের বিষয়টি সময়সাপেক্ষ এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা এখন একটি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত বিষয়। সকল ক্ষেত্রে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন উপায়ে সুবিধাবঞ্চিতদের আইসিটিভিত্তিক সাক্ষরতা প্রদানের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটির সুবিধাগুলি উপলব্ধি এখন একটি উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত যাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ভাল এবং সমৃদ্ধ তারা ডিজিটাল প্রযুক্তিগুলো থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হন।

আর যাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্যের প্রয়োজন তারাই এখন সবচেয়ে পেছনে। ফলে ডিজিটাল বিভাজন ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। সকলের সমান অংশগ্রহণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী ফলাফল প্রাপ্যতা শিক্ষাব্যবস্থায় প্রযুক্তিভিত্তিক উদ্ভাবনের জন্য দিকনির্দেশক হওয়া উচিত। প্রতিকূলতা এই লক্ষ্যে সুযোগে পরিণত হোক। এমতাবস্থায় অনলাইন পাঠদানের বিষয়ে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা/সুপারিশ

০১। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আইসিটিভিত্তিক স্থায়ী অবকাঠামো নির্মাণ;
০২। হাইস্পিড ইন্টারনেট স্থাপন;
০৩। চেতনা বই এর পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্তকরণ;
০৪। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে রেকর্ডিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
০৫। পাঠদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় ও ইন্টারেক্টিভ করা এবং
০৬। আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন (ICT Enable) শিক্ষক নিয়োগ।

অনলাইন শিক্ষার মূল শর্ত হলো, সব শিক্ষার্থীর জন্য ইন্টারনেট এবং অনলাইনে কোর্সের ডকুমেন্ট নিশ্চিত করা। এ সময়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোর্সের ডকুমেন্ট আরো প্রাণবন্ত করা উচিত। এই সিস্টেমে ছাত্রদের টিমওয়ার্ক গঠন করে ব্রেনস্টর্মিং কঠিন। তারপরও আমাদের এই পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে হবে এবং অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। কর্তৃপক্ষ যদি অনলাইন পাঠদানের বাধ্যতামূলক নির্দেশনা দেয় তবে অনেক দরিদ্র শিক্ষার্থী ল্যাপটপ, ইন্টারনেটের অভাবে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে না বলে মনে করি।

অনলাইন টিচিং শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সহজেই ক্লাস নিয়ন্ত্রণ এবং একই সঙ্গে সব শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করতে পারেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কম মনোযোগী শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে পারেন এবং তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ক্লাসে আকৃষ্ট করতে পারেন। তদুপরি, শ্রেণিকক্ষে লেকচারের সময় শিক্ষার্থীদের যেকোনো প্রশ্নের কোনো জটিলতা ছাড়াই সহজে উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সরাসরি কথোপকথনের অভাবে অনলাইন ক্লাসকে সফল করা কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য-পীড়িত নিরক্ষরদের জন্য অনলাইন শিখন সত্যিই একটি চ্যালেঞ্জ। কেননা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুতের বিঘ্নিত সরবরাহ অনলাইন শিক্ষার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। এখনো কিছু মানুষ বিদ্যুৎ সংযোগের বাইরে রয়েছে। অস্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং দুর্বল বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা অনলাইন শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছেন, কিন্তু এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষার্থীরা থাকে যেখানে বিদ্যুৎ নেই। সুতরাং এটি বাংলাদেশের জন্য সাধারণ একটি চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৬০টি জেলার অন্তর্গত ১১৪টি উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত নিরক্ষর জনগোষ্ঠির অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ সত্যই দুরূহ। তাছাড়াও উপর্যুক্ত কাজগুলো রাতারাতি সম্পাদান করা সম্ভব নয়। এমন এক জটিল পরিস্থিতিতে আপদকালের জন্য ২১ লক্ষ নিরক্ষরদের সাক্ষরতা প্রদানের মত মহৎ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে দেশে চলমান ৪৫৫৪টি ডিজিটাল সেন্টারের অবকাঠামো ব্যবহার করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে । মহান ও নিবেদিত পেশায় নিয়োজিত শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁরা স্বেচ্ছায় নিরক্ষরদের সাক্ষরতা প্রদানের মহৎ কাজে এগিয়ে আসবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা।

যাই হোক না কেন একদিন না একদিন আমাদের তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেবার সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। স্বাস্থ্যবিধি পালন করে একদিন ক্লাসরুমে ফিরতেই হবে। সরকার ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে। তবে আমরা যেটাই করতে যাই না কেন তার আগে করোনার বহুমাত্রিক রূপ ও তার ভয়াবহ প্রভাব

মাথায় রেখেই নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা প্রদানের জন্য সময়োপযোগী ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের ছক কষতে হবে নিখুঁতভাবে। কারণ পৃথিবীকে সুন্দর-নিরাপদ রাখতে আমাদেরও যে অনেক কিছু করণীয় আছে তা মনে রাখতে হবে আমৃত্যু। হোক তা নিজের জন্য, আগামী প্রজন্মের জন্য ও গোটা মানবজাতির জন্য। আর এর মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার মহান স্থপতি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

লেখক
সিস্টেম এনালিস্ট
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সাক্ষরতা, উন্নয়ন ও কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলা

মোঃ মোশাররফ হোসেন

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতীয় উন্নয়নে সাক্ষরতা একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। পড়তে, লেখতে, বুঝতে ও হিসেব নিকেশ করার মধ্যেই সাক্ষরতা আর সীমাবদ্ধ নয়। সাক্ষরতার সাথে এখন তথ্য প্রযুক্তি, আয়বর্ধক প্রশিক্ষণও যুক্ত হয়েছে। সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে পরিবার, সমাজ তথা দেশের উন্নয়ন যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এ উপলব্ধি থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭২ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের যে সংবিধান প্রণীত হয় তার ১৭ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১৯৯৬ সনের পূর্বে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫%। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে (১৯৯৭-২০০১ পর্যন্ত) তৎকালীন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে টিএলএম কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে সাক্ষরতার হার ৬০%-এ উন্নিত হয়। এ অর্জনের ফলে বাংলাদেশ ১৯৯৮ সনে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার অর্জন করে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে বর্তমান সরকারের আমলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো'র মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে এখন সাক্ষরতার হার ৭৪.৭%। বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত ২৫.৩% লোক নিরক্ষর রয়ে গেছে। এ বিশাল জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরতার আওতায় এনে উন্নয়নের অংশীদার করা একান্ত আবশ্যক।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার অঙ্গিকারাবদ্ধ। এসডিজি এর লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো নিম্নবর্ণিত লক্ষ স্থির করেছে–

(১) নিরক্ষরতা দূরীকরণ : ১৫+বয়সী ৫০ লক্ষ নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে সাক্ষরতা প্রদান করা হবে।
(২) দেশব্যাপী ৫০২৫টি আইসিটিভিত্তিক স্থায়ী কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন করা হবে।
(৩) ১৫ লক্ষ নব্য সাক্ষরকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করা হবে।
(৪) প্রত্যেক জেলায় একটি করে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

সাক্ষরতা কর্মসূচীর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তা হলো :

(১) ছেলেমেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠানো।
(২) নিরাপদ পানি পান করা।
(৩) স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা।
(৪) বাল্যবিবাহ দেয়া থেকে বিরত থাকা।
(৫) মাদক সেবন থেকে বিরত থাকা।
(৬) হাস-মুরগী, গবাদীপশু পালন এবং মাছ চাষ করে সাবলম্বী হওয়া।
(৭) জমি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সচেতেনতা অর্জন।
(৮) মোবাইল ফোন ব্যবহার করা।
(৯) আইটি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জন।

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের জিডিপির হারও বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জিডিপি ৮.২% এবং মাথাপিছু আয় ১৯০৯ ডলার। পূর্বের তুলনায় মাথাপিছু আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকেই বোঝা

যাচ্ছে বাংলাদেশের উন্নয়নের সাথে সাক্ষরতার একটা সম্পর্ক আছে।
সারা বিশ্বর ন্যায় বাংলাদেশেও গত মার্চ/২০২০ থেকে করোনার মহামারি দেখা দেয়। কোভিড-১৯ সংকটের কারণে সরকার সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চালিয়ে নেয়ার জন্য সরকার সংসদ টিভি বাংলাদেশের মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস চালু রেখেছে। কোভিড-১৯ সংকটের ফলে শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে কিভাবে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা যায় সে বিষয়ে সরকার গভীরভাবে ভাবছে।

বাংলাদেশের সামনে এখন মূল চ্যালেঞ্জ কোভিড-১৯ সংকটকালে সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ করা। এ কৌশল নির্ধারণ করতে হলে শিক্ষাবিদদের এগিয়ে আসতে হবে এবং দ্রুত একটি নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। আশা করা যাচ্ছে অতি শ্রীঘ্রই আমাদের দেশের শিক্ষাবিদগণ সরকারের সহায়তায় নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ঘটাতে সক্ষম হবেন।

পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবকাঠামোগতভাবে বাংলাদেশ পূর্বের তুলনায় অনেক এগিয়ে গেছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এখন আমরা বাস্তবে দেখছি। আশা করছি, ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশের কাতারে শামিল হবে।

মোঃ মোশাররফ হোসেন
উপ-পরিচালক (বাস্তবায়ন)
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো।

আমাদের শিশুরা ফিরবে কবে?

ড. শোয়াইব জিবরান

হঠাৎ করেই শিশুরা সে সকল সবুজ মাঠ হতে, ঘর হতে হারিয়ে গেল। থেমে গেল তাদের কলকাকলী। যেন অদৃশ্য কোনো দৈত্য এসে তাদের ধরে নিয়ে গেছে। নিয়ে কোথাও বন্দী করে রেখেছে।

সত্যই পৃথিবীতে হঠাৎ করেই এক দৈত্যকূল ছড়িয়ে পড়েছে। গল্পের দৈত্য বিরাটকার হলেও এ প্রাণঘাতি দৈত্যকূল আনুবিক্ষণিক। তাদের চোখে দেখা যায় না। কিন্তু তারা আততায়ী। এ অদৃশ্য দৈত্য, আততায়ীর নাম- করোনা। এ আততায়ীই যেন মাঠের শিশুদের, স্কুলের কলরবরত সে সকল স্বর্গীয় দূতদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে কোথাও। তারা হয়ত জগৎ থেকে হারায়নি। কিন্তু তাদের যেখানে সময় কাটানোর কথা আগামী দিনের প্রস্তুতির জন্য, বেড়ে ওঠার জন্য সে সকল স্থান থেকে হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গিয়ে ঘরে আটকা পড়েছে। কেউ কেউ সে পরিচিত ঘরও হারিয়েছে। আমরা পার করছি এক নতুন মহামারির কাল। করোনা কাল।

হঠাৎ করেই এ ভয়াবহ নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দেশে দেশে শিশুদের স্কুল কলেজগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষত বাংলাদেশে বিরাট একটা অংশের শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হয়ে গেছে বা চাকুরি হারিয়েছেন। বড় অংশের অভিভাবকদেরও আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে গেছে, চাকুরি হারিয়েছেন। সংবাদপত্র বলছে- গত কয়েকমাসে পঞ্চাশ হাজার অভিভাবককে ঢাকা শহর ছাড়তে হয়েছে। সাথে এ পরিবারগুলোর শিশুরাও তাদের স্কুল থেকে হারিয়ে গেছে। তারা কি আবার তাদের স্কুলে ফিরে আসতে পারবে? মহামারি উত্তর অর্থনৈতিক মন্দার যে আশংকা করা হচ্ছে তাতে যদি সে অভিভাবকদের আয়ের উৎস শহরে আবার চালু না হয়- তাহলে এ শিশুগুলো একদম নতুন শিখন পবিবেশের মুখোমুখি হবে।

আমাদের একজন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বলেছেন, আমরা একদম আদিম মানুষের মত গুহাদশায় চলে গেছি। গুহার বাইরের শত্রুকে মোকাবেলা করার কোনো অস্ত্রই আমাদের হাতে নেই। সাহস করে বড়দের কেউ কেউ গুহা থেকে বেরিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। আক্রান্ত হয়ে তারা মারাও পড়ছেন। স্কুলগামী শিশুরা একদমই গুহায় আটকে পড়েছে। স্কুল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সময় তো বসে নেই। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই শিশুদের সে বাস্তব পরিস্থিতির উপযোগী হতে হবে। জীবনের প্রস্তুতি নিতে হবে। সে শিক্ষার ব্যবস্থা কই? কবে তারা স্কুলে ফিরতে পারবে? কবে ফিরবে?

আপদকালীন একটা ব্যবস্থা হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছে অনলাইন এডুকেশনকে। কিন্তু বাংলাদেশে কি সে উপযোগী ব্যবস্থা আছে? সবার জন্য সকল স্থানের জন্য সমানভাবে আছে?

দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সন্তানকে অনলাইন ক্লাশের উপযোগী ডিভাইস কিনে দিতে না পারার অক্ষমতায় পিতা আত্মহত্যা করেছেন- এ রকম একটি সংবাদ কয়দিন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরেছে। সংবাদটি সত্য মিথ্যা যাই হোক- এটা এক করুণ নতুন বাস্তবতা।

সহজ করে বললে, অনলাইন শিক্ষার একদম প্রাথমিক দুটো বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে- উপযোগী ডিভাইস আর নেট। প্রথাগত পড়ালেখার জন্য যেমন স্কুল আর বইপত্র। আর আছে অনলাইন শিক্ষার উপযোগী শিক্ষা উপকরণ। প্রথাগত শিক্ষায় আমরা যে মুদ্রিত বই, বোর্ড, চক বা পেন-পেন্সিল ব্যবহার করি অনলাইন একুকেশনে এগুলো খুব কাজে আসবে না। বিশেষত মুদ্রিত বইপত্র।

অনলাইন এডুকেশনে ব্যবহৃত উপকরণগুলোকে প্রধানত হতে হয় ডিজিটাল বা ডিজিটাল মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী। ফলে মুদ্রিত সামগ্রী ব্যবহার করতে চাইলে তাকে ডিজিটালে রূপান্তরিত করে নিতে হবে।

অনলাইন ক্লাশ নেয়ার জন্য আরও প্রয়োজন হয় প্লাটফরমের বা এ্যাপসের। বর্তমানে অনলাইন এডুকেশনে প্রধানত গুগল ক্লাশরুম, গুগল মিট, স্ট্রিম ইয়ার্ড আর জুম ব্যবহারে করা হচ্ছে। বাংলাদেশে জুম বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। এর একটি প্রধান কারণ জুমকে সরকারের এটুআই প্রকল্প ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জন্য কাস্টমাইজড করেছে। বিডিরেনের মাধ্যমে তা সরকারের বিশেষত উচ্চশিক্ষায় ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে জুম চাইলে যে কেউ ফ্রি সফটওয়ার হিসেবেও ব্যবহার করতে পারেন। সমস্যা একটাই এ ক্ষেত্রে প্রতি ৪০ মিনিট করে একটানা ব্যবহার করা যাবে। অবশ্য অনলাইন ক্লাশ একটানা চল্লিশ মিনিটের বেশি চালানোও খুব যুক্তিযুক্ত নয়। ফলে যে কেউ জুম ব্যবহার করতে পারেন। জুমের বিশেষ সুবিধাগুলো হলো- এটিতে আগে থেকে ক্লাশের সময়সূচি তৈরি করে শিক্ষার্থীদের মেইল, ফেসবুক গ্রুপ ইত্যাদির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে আসতে পারে। প্রস্তুত হতে পারেন শিক্ষকও। জুমের ক্লাশে আরও সুবিধা হচ্ছে, এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সরাসরি অডিও-ভিডিওর মাধ্যমে যুক্ত হতে পারেন। শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থী প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতে পারেন। আরও বিশেষ সুবিধা হচ্ছে, শিক্ষক তাঁর কাছের ডিভাইসের স্ক্রিন শেয়ার করতে পারেন। ফলে শিক্ষক লিখিত কিছু নানাভাবে দেখাতে পারেন। সেটি ওয়ার্ড পাওয়ার পয়েন্ট যেভাবেই হোক। শিক্ষক স্ক্রিন শেয়ারের মাধ্যমে যে কোনো অডিও ভিডিও সামগ্রীও শোনাতে ও দেখাতে পারেন। এগুলো করার জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণেরও খুব প্রয়োজন হয় না। এ সফটওয়ারটিসহ অন্যা সফটওয়ারও ব্যবহার অনেক বেশি ব্যবহারকারী বান্ধব। ফলে শিক্ষক নিজে থেকে শিখে নিতে পারেন। গুগল মিট ফ্রি ব্যবহার করলে সেখানে সময়েরও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই শিক্ষক এগুলোর যে কোনো একটি তার নিজ পছন্দ মত বেছে নিতে পারেন। আর এগুলো খুব সহজেই ডাউনলোড করে নেয়া যায়। শিক্ষক তার নেয়া এক একটি ক্লাশ চাইলে রেকর্ড করেও রাখতে পারেন। তিনি তার সে ক্লাশ নিজস্ব ব্লগ, ফেসবুক গ্রুপ, পেজ বা ইউটিউবে আপলোড করতে পারেন। যা চাইলে তার শিক্ষার্থীরা যে কোনো সময় ব্যবহার করতে পারবে। এ ছাড়া অন্যান্য শিক্ষার্থীরাও ব্যবহার করতে পারবে। তবে এ সফটওয়ারগুে-লা ব্যবহার করে শিক্ষক মূল্যায়নেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। বিশেষত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। তবে লিখিত পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে খানিকটা সন্দেহ থাকতে পারে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে আর কীভাবে কার্যকর করা যায় তা নিয়ে কাজ চলছে। তবে বাংলাদেশের বা কম উন্নত বিশ্বের জন্য আরও কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

আমাদের শিক্ষার্থীদের এক বিপুল অংশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর। অনলাইন ক্লাশ করার মত স্মার্টফোন তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা সেটা বিবেচনায় নিতে হবে। ১৮ বৎসরের নিচের শিশুদের হাতে নেট সংযোগসহ ডিভাইস তুলে দেয়ার অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে চিন্তা করতে হবে।

আর সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় নেট। নেটের গতি আর ডাটার দিক ভাবতে হবে। সব জায়গায় থ্রি জি গতিই নেই। আর একটি প্রতিষ্ঠান যদি প্রতিদিন ৫/৬ টিও ক্লাশ অনলাইনে নেয় তাহলে এই ৪/৫ ঘণ্টার ভিডিও স্ট্রিমিং দেখতে প্রতিদিন কত ডাটা এবং মাসে কী বিপুল পরিমাণ ডাটা লাগতে পারে বিবেচনায় নিতে হবে।

অনেক স্কুলে যেখানে বেতনের টাকা দেয়াই অভিভাবকদের জন্য কষ্টকর সেখানে বেতনের বাইরেও এই বিপুল ডাটার বিল যোগানো কঠিন হবে।

ফলে সামর্থ্যবান পরিবারের শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ থাকলেও প্রান্তিকদের বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থেকে যাবে। একটি বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা চালু হবে। তাই বলে কি আমরা বসে থাকবো? না। এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাব হচ্ছে-

-শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে দোয়েলের মত ডিভাইস সুদবিহীন কিস্তিতে দেয়া যেতে পারে। দেশে সংযোজিত কম দামের স্মার্টফোনও হতে পারে।

শিক্ষার্থীদের টেলিটকের মাধ্যমে কম বা বিনামূল্যে মোবাইল সংযোগ দেয়া যেতে পারে। সার্চ কাস্টমাইজড করা যেতে পারে, যাতে পড়ালেখার বাইরে শিশুরা অনাকাঙ্ক্ষিত সাইটে প্রবেশ করতে না পারে।

বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর বিনামূল্যে বই বিতরণ বাবদই হাজার হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করে থাকেন। নতুন এ বিনিয়োগ অযৌক্তিক হবে না। করোনার অদৃশ্য দৈত্য চলে গেলেও এ বিনিয়োগ কাজ দেবে। শিক্ষাদান পদ্ধতির বহুমুখীকরণ ঘটবে।

আশার কথা বাংলাদেশ সরকার এ নিয়ে ভাবছেন, নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু শেষ অবধি আমরা অপেক্ষা করছি শিশুগুলো সত্যিকার স্কুলে ফিরে আসবে কবে? কবে আবার ভরে উঠবে তাদের কলকাকলীতে স্কুলের সবুজ মাঠ, ঘর?
কবে?

ড. শোয়াইব জিবরান
সদস্য, বোর্ড অব গভর্নরস, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ড প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;
অধ্যাপক, বাংলা, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্কুল চলাকালীন সময়ে কোভিড প্রতিরোধের জন্য স্বাস্থ্য নির্দেশিকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

ড. জিয়া-উস-সবুর

সারা বিশ্বজুড়ে কোভিড মহামারি জনজীবনকে সংকটাপন্ন করে তুলেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতোই বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। বাংলাদেশ ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আইসিটি সহায়তায় দূর শিক্ষণ প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমিত সাফল্য অর্জন করেছে। তার কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর কাছে স্মার্টফোন কম্পিউটার ট্যাবলেট কিংবা ইন্টারনেট সুবিধা নেই। ফলে কেবল শহরকেন্দ্রিক অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ছেলেমেয়েরাই দূরশিক্ষণ সুবিধা ভোগ করতে পারছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোভিড কখন সম্পূর্ণরূপে নির্মূল হবে এ ব্যাপারে সঠিক নিশ্চয়তা পাওয়া যাচ্ছে না। পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষাবিদ এবং কোভিড বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় ও কার্যকর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে স্কুল পুনরায় খোলা ছাড়া তেমন কোনো বিকল্প হয়তো নেই। সুতরাং পরিস্থিতির বাস্তবতা বিবেচনা পূর্বক ইউনিসেফ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রেডক্রস আন্তর্জাতিক ফেডারেশন-এর যৌথ প্রয়াসে মার্চ নামে একটি নির্দেশিকা উদ্ভাসিত হয়েছে। ২০২০ সালের নির্দেশিকা শিরোনাম হচ্ছে, 'Key Messages and Actions for Covid-19 Prevention and Control in Schools'.

এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনের উল্লিখিত নির্দেশিকার মূল অংশ পাঠকের জানার সুবিধার্থে উপস্থাপন করা হল। এখানে উল্লেখ্য যে নির্দেশিকাটিতে শুধু ছাত্রছাত্রীরা নিরাপদে স্কুলে পড়াপশোনার পাশাপাশি সমাজের জনগোষ্ঠীকে সঠিক তথ্য দিয়ে কিভাবে কোভিড থেকে নিরাপদ থাকবে এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যথাসম্ভব ইতিবাচক ভূমিকা রাখার কথাও বলা হয়েছে।

নির্দেশিকাটি স্কুলের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩ ধরনের জনগোষ্ঠী বিবেচনায় তৈরি করা হয়েছে। উল্লিখিত তিন ধরনের ১। স্কুল প্রশাসক, শিক্ষক এবং স্কুল কর্মচারী; ২। অভিভাবক কমিউনিটি সদস্য ও সেবাদানকারী; ৩। স্কুলের ছাত্র ছত্রী বৃন্দ।

১. স্কুল প্রশাসক, শিক্ষক এবং স্কুল কর্মচারী সংক্রান্ত নির্দেশিকা :

মূলনীতি

- শিক্ষক কিংবা ছাত্র-ছাত্রী যেকোনো কারণে অসুস্থ বোধ করলে কোনো অবস্থায় যেন স্কুলে না আসে। নিরাপদ পানি এবং সাবান দিয়ে সবাইকে হাত ভালোভাবে ধুতে বাধ্য করা।
- স্কুলে নিরাপদ পানি স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং স্কুলের পরিবেশকে জীবাণুমুক্ত রাখা। সকল অবস্থায় স্কুলের মধ্যে নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। কোভিড সংক্রান্ত সর্বশেষ খবর জানার জন্য সজাগ থাকা।
- বিশ্ববাসী কোভিড সম্পর্কে জেনেছে সেটা বেশিদিন আগের কথা নয়। ফলে কোভিড উৎপত্তি এবং তার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে নতুন তথ্য বের হচ্ছে। এই নতুন তথ্যের সাথে সবসময় নিজেকে যুক্ত রাখতে হবে।
- সাবান দিয়ে হাত ধোয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসম্মত সেনিটেশন ব্যবস্থা স্কুলে নিশ্চিত করণ কোভিড প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার জন্য প্রতিটি ক্লাসরুমের জন্য পর্যাপ্ত স্যানিটাইজা

ব্যবহার বিস্তৃত করতে হবে। তাছাড়া, স্কুলের প্রবেশ এবং বহির্গমন পথে স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা সহ টয়লেটেও একই ব্যবস্থা রাখতে হবে।

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে আছে

- দিনে একবার অন্তত স্কুলের বিল্ডিং সহ স্কুলের মেঝে, পাখা ও বাতির সুইচ প্রস্তুতি যেসব স্থানে মানুষের হাত বেশি ব্যবহৃত হয় সেসব জায়গায় সেনিটাইজার প্রয়োগ করতে হবে।

স্কুলের সবক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- যেকোনো সময়ে স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যাতে কম হয় সেজন্য বিভিন্ন শ্রেণি বিভি সময়ে আরম্ভ করা উচিত।
- স্কুলে যেকোনো কারণে যে কোন ধরনের সমাবেশ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ক্লাস রুমের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের বসার জায়গা এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যাতে একজন থেকে আরেকজনের মাঝে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য দূরত্ব বজায় থাকে।
- শিক্ষক শিখন পদ্ধতি প্রয়োগের সময় দলীয় পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য নিয়মিত প্রকৃত পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ছাত্রছাত্রী কিংবা শিক্ষক যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে তাকে দ্রুত স্কুল থেকে সরিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের পরিবারের কেউ যদি কোভিড আক্রান্ত হয় সেক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে অবহিত করণ এবং স্কুলে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- কোন ছাত্র-ছাত্রী কিংবা শিক্ষক যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তাদের স্কুলে না এসে বাসায় থাকার পরামর্শ দেওয়া উচিত। একই সাথে ছাত্রছাত্রী শিক্ষকের বাসায় কেউ যদি কোভিড আক্রান্ত হয়ে পড়েন সেক্ষেত্রেও তাদের স্কুলে না আসার পরামর্শ দেওয়া উচিত।
- স্কুল কর্তৃপক্ষের উচিত নিয়মিত ভাবে ছাত্র-ছাত্রী এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত ভাবে অবগত করা। তাছাড়া কোভিড প্রতিরোধের জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন সে ব্যাপারে নিয়মিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করা।
- ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা। শ্বাসকষ্টজনিত কারণে যদি স্কুলে অনুপস্থিতির হার অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা।
- কোভিভ সংক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন আসে এবং স্কুলে কিংবা বাসায় তারা কোভিড সংক্রান্ত যেকোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে সে ব্যাপারে শিক্ষকমন্ডলী নিয়মিতভাবে জানার চেষ্টা করবেন এবং যথাসম্ভব সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন।
- স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্নভাবে সাহায্যের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করবেন। এই দুর্যোগের সময় কোনো ছাত্র-ছাত্রী যাতে কোনরকম হয়রানির সম্মুখীন না হয় সে ব্যাপারে শিক্ষকমন্ডলী বিশেষ নজর রাখবেন।
- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাপারে শিক্ষকমণ্ডলী বিশেষ যত্নবান হবেন। তাছাড়া, শারীরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সহায়তা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- কোভিড মোকাবেলায় স্কুল প্রশাসক শিক্ষকমণ্ডলী এবং স্কুল কর্মচারীদের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করা।
- পর্যাপ্ত সাবান এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- সব ছাত্রছাত্রী যাতে সঠিকভাবে সাবান দিয়ে হাত (ন্যূনতম ২০ সেকেন্ড ধরে) ধোয়ার অভ্যাস করে সেটা নিশ্চিত করা।
- ওয়াশরুম টয়লেট ক্লাসরুম হল রুম স্কুলের প্রবেশ এবং বহির্গমন পর্থ সহ অন্যান্য সমস্ত স্থান যেখানে ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশের সম্ভাবনা আছে সেসব জায়গায় পর্যাপ্ত স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা করা।

- প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্কুলের বিল্ডিং, ক্লাসরুম, ওয়াশরুম, টয়লেটসহ স্কুলের অন্যান্য অংশ জীবাণুনাশক কেমিক্যাল দিয়ে পরিষ্কার করা।
- স্কুলের প্রতিটি ক্লাসরুমে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নিশ্চিত করা।

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে সে জন্য স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা এবং পোস্টার স্কুলের বিভিন্ন জায়গায় টাঙ্গিয়ে রাখা।

২) কোভিড মোকাবেলায় অভিভাবক সেবাদানকারী এবং কমিউনিটি সদস্যদের জন্য নির্দেশিকা। কেভিড সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদান :

কোভিড-এর ব্যাপারে প্রতিদিন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। যা করোনার কার্যকর মোকাবেলার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সে কারণে কমিউনিটির সবাই সবসময় সচেতনভাবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম থেকে সংবাদ সংগ্রহ করবেন। সে তথ্য বিশেষকরে পিতা-মাতা এবং সেবাদানকারীর ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আদান প্রদান করবেন। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সংবাদমাধ্যমগুলি থেকে অনেক গুজব এবং ভুল তথ্য পরিবেশিত হচ্ছে কিনা? এসব ভ্রান্ত তথ্য জনসমষ্টির জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে। ভুল তথ্য থেকে দূরে থাকার জন্য যে বিষয়টি অত্যন্ত প্রয়োজন সেটি হচ্ছে সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত সংবাদের তথ্যসূত্র নিশ্চিত করা। অর্থাৎ তথ্যসূত্র যাতে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান থেকে আহরিত কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা। যেমন বলা যেতে পারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউনিসেফসহ বিশ্বের অনেক খ্যাতনামা গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাদের থেকে তথ্য গ্রহনের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

কোভিড এর উপসর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখা

কমিটির সদস্যদের মধ্যে করোনা সংক্রমনের উপসর্গের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষকরে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের এই উপসর্গ দেখা দিলে তাদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কোভিড-এর সংক্রমণের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে পরীক্ষা করতে হবে।

অসুস্থ শিশুর লেখাপড়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের করণীয়

শিশু যদি করোনার কিংবা অন্য কোনো কারণে অসুস্থ এবং স্কুলে যেতে না পারে সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্ব হবে স্কুলের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা। স্কুলে যে সমস্ত ঘরের কাজ দেওয়া হয়েছে সে সব কাজের ব্যাপারে অবগত থাকা। সেইক্ষেত্রে অসুস্থ শিশু যদি সক্ষম হয় তাহলে ঘরের কাজের পিছনে কিছু সময় যাতে ব্যয় করে সেটা নিশ্চিত করা।

শিশু যদি সুস্থ থাকে তবে অভিভাবকদের উচিত তাদের স্কুলে যেতে দেওয়া। তা না হলে তাদের পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা রেয়েছে। তবে স্কুলে যাতে তারা সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি ঠিকমতো মেনে চলে সে ব্যাপারে অভিভাবকদের সজাগ থাকতে হবে।
বিশেষকরে হাত ধোয়ার ব্যাপারে অভিভাবকরা তাদের শিশুদের নিম্নলিখিত নির্দেশনা দিবেন
প্রথমত : নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ভলোভাবে ধুতে হবে।
দ্বিতীয়ত : হাতে ভালো মতো সাবান মাখতে হবে।
তৃতীয়ত : অন্তত ২০ সেকেন্ড ব্যাপী হাত ভালো করে ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে হবে যাতে করে হাতের আঙুলের মাঝখানে এবং রক্তের ভিতরে ভালো করে পরিষ্কার হয়।
চতুর্থত : চলন্ত পানিতে হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।
পঞ্চমত : পরিষ্কার শুকনো কাপড়, টাওয়েল কিংবা টিস্যুপেপার দিয়ে হাত মুছে ফেলতে হবে।

শিশুদের প্রশ্ন করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। কোভিড মহোমারি সম্পর্কে তাদের ভিন্ন মত বা ধারণা থাকতে পারে। সে সমস্ত বিষয় ধৈর্যের সাথে শুনতে হবে।

এই মহোমারির সময় অনেক শিশু মানসিক চাপে থাকে। এই মানসিক চাপের বিভিন্ন উপসর্গ থাকতে পারে যেমন অল্পতে রেগে ওঠা বিমর্ষ অবস্থায় থাকা, চিৎকার করা, অন্যের সাথে ঝগড়া করা, মাথাব্যথা, খাবারে অনীহা ইত্যাদি। এ অবস্থায় শিশুদের সময় দিতে হবে, তাদের সাথে কথা বলতে হবে এবং তাদেরকে আশ্বস্ত করতে হবে।

অভিভাবক সেবাদানকারী এবং কমিউনিটি সদস্যদের জন্য চেকলিস্ট

আপনার শিশুর শারীরিক অবস্থার নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের স্কুলে পাঠাবেন না।

করোনাকালে শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অবহিত করণ এবং তা নিজে বাস্তবে নিয়মিত অনুসরণ করে শিশুদের দেখান।

নিম্নলিখিত বিষয় আপনার শিশুকে বুঝান এবং নিজে করে দেখান :

- হাতে যদি দৃশ্যমান ময়লা থাকে তাহলে হাত সাবান এবং নিরাপদ পানি দিয়ে ভাল করে পরিষ্কার করুন।
- ঘরের মধ্যে নিরাপদ পানির ব্যবস্থা এবং টয়লেট ভালোভাবে পরিষ্কার রাখুন।
- ঘরের বর্জ্য নিরাপদ অবস্থায় সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- আপনার শিশু হাঁচি অথবা কাশি দিলে যাতে টিস্যুপেপার ব্যবহার অথবা হাতের কনুই দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে।
- আপনার শিশু যাতে কোনো অবস্থাতেই মানসিক চাপে ভেঙে না পড়ে তার জন্য কোভিড সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন বিশেষত কোভিড সংক্রান্ত উদ্বেগজনক প্রশ্নের উত্তর ধৈর্য সহকারে দেয়ার চেষ্টা করবেন।
- কোভিড কিংবা করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধে শিশুরা যাতে কোনোরকম নেতিবাচক চিন্তা না করে সে বিষয়ে সচেতন থাকা।
- স্কুলের সাথে অভিভাবক শিক্ষক কমিটির সহায়তায় সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা যাতে শিশুদের স্বাস্থ্যগত নিরাপত্তা স্কুল এবং বাসায় কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

৩) ছাত্র-ছাত্রী এবং ঘরে শিশু সংক্রান্ত

কোভিড ব্যাপারে বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্য

যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সত্যতা নিরূপণ করতে হবে। তথ্যের গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চিত করণে সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রদত্ত তথ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইউনিসেফ কিংবা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত তথ্যসমূহ সত্য এবং গ্রহণযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

মহোমারির এই পর্যায়ে তোমরা হতাশ হয়ে পড়তে পারো তোমাদের মধ্যে বিষণ্নতা দেখা দিতে পারে রাগ সহ অন্যান্য নেতিবাচক অনুভূতি প্রকট হয়ে উঠতে পারে। এই ধরনের মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। যেকোনো রকম নেতিবাচক অনুভূতি দেখা দিলে তোমরা যাদের বিশ্বাস কর এবং দায়িত্বশীল বলে মনে করো সেই ব্যক্তিদের কাছে তোমাদের মনের প্রশ্ন এবং অনুভূতি প্রকাশ করো। যেমন হতে পারে, তোমার বাবা-মা শিক্ষক কিংবা অন্য কোনো অভিভাবক। প্রশ্ন করো নিজেকে এবং অন্যকে বাঁচাও নিজেকে কোভিড-এর ব্যাপারে শিক্ষিত করে তোল এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করো।

- অন্তত ২০ সেকেন্ড জুড়ে সাবান এবং নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া অভ্যাস করো।
- নিজের মুখ কখনোই হাত দিয়ে স্পর্শ করবে না।

- কারো সাথে খাবার সরঞ্জামাদি, কাপ, খাদ্যসামগ্রী এবং পানীয় কোনো অবস্থাতে ভাগাভাগি করবে না
- স্কুল পরিবার এবং কমিউনিটির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য তোমাদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- কোভিড-এ আক্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক চিন্তা থেকে বিরত থেকো।
- অসুস্থ বোধ করলে তাৎক্ষণিক অভিভাবক মা-বাবা শিক্ষক বা কমিউনিটির সদস্যকে অবহিত করো।

উল্লিখিত নির্দেশনা সাধারণ স্কুলের জন্য বেশি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো তারা বাস্তবায়িত চলমান out of school children প্রকল্পের ক্ষেত্রে হয়তো সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য হবে না। সেইক্ষেত্রে কমিউনিটিকে অধিক সম্পৃক্ত পূর্বক উল্লিখিত শিশুদের বাস্তবতার আলোকে মাঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি কার্যকর নির্দেশিকা তৈরির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

লেখক
ফ্রিল্যান্সার
সাবেক প্রফেসর
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : কোভিড-১৯ সংকট

ড. মোছাঃ ফাহমিদা বেগম

দেশের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও সাক্ষরতার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিনির্মাণে সাক্ষরতার কোন বিকল্প নাই। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) আওতায় বিভিন্ন সেক্টরের জন্য মোট ১৭টি অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। যার মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা-৪ গুণগত শিক্ষা সংক্রান্ত। লক্ষ্যমাত্রা-৪: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি। এর মধ্যে টার্গেট-৪.৬ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সরাসরি জড়িত। টার্গেটটি হলো–নারী ও পুরুষসহ যুবসমাজের সবাই এবং বয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যাতে ২০৩০ সালের মধ্যে সাক্ষরতা ও গণন-দক্ষতা অর্জনে সফলকাম হয় তা নিশ্চিত করা। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার–২০১৮-এর লক্ষ্য ও পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে ০৫ বৎসর মেয়াদী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ এর আলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য যেসকল কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)' অন্যতম। এই কর্মসূচিটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) ৪.৬ টার্গেট অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলায় নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলার ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের নিমিত্তে ইতোমধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৩৪টি উপজেলায় ৩৯,৩১১টি শিখন কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৩,৫৯,৪৪১ (তেইশ লক্ষ ঊনষাট হাজার চার শত একচল্লিশ) জন নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে অর্থাৎ মুজিববর্ষে এ প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে সারাদেশে ৩৫ হাজার শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের জন্য মার্চ, ২০২০ মাসের শেষ সপ্তাহে কার্যক্রম শুরু করার সকল প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে সরকার কর্তৃক তা স্থগিত করা হয়। অন্যদিকে, চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া ৮-১৪ বছর বয়সী ১০ লক্ষ শিশুকে সেকেণ্ডচান্স এডুকেশন প্রদান করে শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করার অংশ হিসেবে ০১ লক্ষ শিক্ষার্থীকে নিয়ে পাইলট কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বাকি ০৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর শিক্ষাকেন্দ্র চালুকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪-এর ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ের ১৪৭৩টি পদ চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া ২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বোর্ডের পদসৃজন এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিধিমালা, ২০২০ অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। দেশকে সম্পূর্ণরূপে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করার লক্ষ্যে সাব-সেক্টর এপ্রোচের মাধ্যমে 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির' ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যাচাই-বাছাই চলছে। এই 'উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দেশের সকল নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরত-াজ্ঞান প্রদানসহ দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা সম্ভব হবে।

বিশ্বব্যাপী করোনার প্রাদুর্ভাবের ফলে বাংলাদেশেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘসময় বাড়িতে থেকে যেন পড়াশুনা ভুলে না যায় বা অমনোযোগী না হয়ে পড়ে, লেখাপড়ার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন' ও বাংলাদেশ বেতারসহ কমিউনিটি রেডিও এর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ভিত্তিক পাঠদান কর্মসূচি 'ঘরে

বসে শিখি' নামক প্রচারিত হচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সেকেন্ডচান্স এডুকেশন প্রকল্পের ০৬টি জেলায় চলমান পাইলট কর্মসূচির শিক্ষার্থীরাও এই পাঠদান কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। টেলিভিশন ও রেডিও এর মাধ্যমে এ সকল দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিশ্চিত করার জন্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে মনিটরিং করা হচ্ছে।

কোভিড-১৯ এর কারণে এ দেশে স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, খাদ্য, কর্মসংস্থান, আয় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। দারিদ্রে বাড়ছে। শিক্ষা এবং শিখন পদ্ধতি বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যার কারণে-গ্রাম ও শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বা হবে। গ্রামের শিক্ষার্থীদের টিভি, বেতার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন ইত্যাদির পর্যাপ্ততা না থাকার কারণে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে পরিচালিত অনুষ্ঠানসমূহে তারা অর্ন্তভুক্ত হতে পারছে না। আবার তাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকগণ স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর হওয়ায় তাঁরা তাদের সন্তানদের পড়ালেখায় সহযোগিতা করতে পারছেন না। তাঁরা নিজেরাই হয়তো কোন না কোন বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্রের শিক্ষার্থী। শহরের শিক্ষার্থীদের পরিবারের কাছে মৌলিক চাহিদা অর্থাৎ খাদ্যের সমস্যা সমাধান গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার চেয়ে। এর মাধ্যমে শিক্ষা বহির্ভূত স্ট্রিট শিশুর সংখ্যা বাড়ছে বা বাড়বে। শহরের বস্তি এলাকাতে পরিবার থেকে নিজেদের শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি বা শিক্ষা প্রদানের সুবিধা নাই। শিশু ও নারী নির্যাতন বেড়ে যাচ্ছে। মানসিক স্বাস্থের অবনতি হচ্ছে। বয়স্ক ব্যক্তিরা অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে। পরিবারের অভিভাবক ও পিতা-মাতার কোভিড-১৯ এর বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকার কারণে তাঁরা তাদের পরিবারকে সেভাবে সাহায্য করতে পারছেন না। কোভিড-১৯ এর কারণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যেসকল প্রভাব পড়ছে বা পড়বে-

- ঝরেপড়া শিক্ষার্থী সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে;
- শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির সংখ্যা বাড়বে;
- অপুষ্টিজনিত কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা কমে যাবে;
- পরিবারের পিতা-মাতার কাজ কমে যাওয়া বা না থাকার কারণে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য শিশুরা পড়ালেখা ছেড়ে শিশু শ্রমিকে রূপান্তরিত হবে;
- বাল্যবিবাহ বেড়ে যাচ্ছে বা যাবে;
- অল্প বয়সে মা হওয়ার প্রবণতা বাড়বে;
- অনলাইনে কিছু কিছু লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হলেও শিক্ষকদের পর্যাপ্ত আইসিটি জ্ঞান না থাকার কারণে তারা এই পদ্ধতিতে আগ্রহী হবে না।

কোভিড-১৯ এর কারণে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ থেকে উত্তরণের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি সিডিউল পরিবর্তন করে কর্মঘণ্টা বাড়িয়ে কোর্স সম্পাদন করা যেতে পারে। উপবৃত্তি বৃদ্ধি করে খাদ্য সহায়তা অব্যাহত রাখা যেতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হ্যাণ্ডওয়াসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। হ্যান্ড ওয়াস, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতার জন্য বিভিন্ন ছবি সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা যেতে পারে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও প্রতিকার এর বিষয়ে লক্ষ্য জনগোষ্ঠী নিয়ে উঠান বৈঠক করা যেতে পারে। কোভিড-১৯ মহামারির তথ্য বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণে সন্নিবেশিত হতে পারে।

পরিশেষে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে এদেশবাসী অনেক কিছু শিখেছে। কোভিড-১৯ এর প্রভাবসমুহ মোকাবেলা করার জন্য পরবর্তী সময়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় পরিকল্পনা করার প্রয়োজন হবে। আমরা অতি শীঘ্রই এই কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচিসমূহের সফল বাস্তবায়ন করে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার সংগ্রামে এগিয়ে যাব।

ড. মোছাঃ ফাহমিদা বেগম
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

কোভিড-১৯ সংকট
সাক্ষরতায় এর প্রভাব ও সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয়

দিলীপ কুমার সরকার

কোভিড-১৯ মহমোরিতে বিশ্ব এক আতঙ্কজনক সময় অতিবাহিত করছে। করোনা ভাইরাস বিশ্বের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিবিধিতে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কোভিড-১৯ এর আক্রমণে শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ এ দুর্যোগে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ গৃহবন্দি জীবনযাপন করছে। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে পুরো দুনিয়ায় যে স্থবিরতা নেমে এসেছে তা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাও রেহাই পায়নি। বিশ্বে শিক্ষা কার্যক্রম থমকে গেছে। উন্নত দেশগুলো অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম এগিয়ে নিলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কেবল শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান ব্যবস্থায় অধিকতর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে এই স্থবিরতা প্রকটরূপে জেঁকে বসেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক, ভ্যাকসিন আবিষ্কার ও সহজলভ্য না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার বিকল্প পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরে পূর্ব এশিয়ার দেশ চীনের সমুদ্র উপকূলীয় শহর উহানে প্রথম করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয় নভেল। সেখান থেকে বিশ্বের প্রায় ১৮৮ দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভয়ানক এই নভেল করোনা ভাইরাস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিরলস প্রচেষ্টায় বর্তমানে দেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৭৪.৭ ভাগে উন্নীত হয়েছে। অবশিষ্ট ২৫.৩ শতাংশ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সদাশয় সরকার। যার অংশ হিসেবে দেশের ৬৪ জেলার নির্বাচিত ২৫০টি উপজেলায় ১৫ এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ৪৫ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে সাক্ষরতাজ্ঞান প্রদানের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো 'মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প' (৬৪ জেলার মাধ্যমে কর্মসূচি পরিচালনা করছে। আবার দরিদ্রতা, অনগ্রসরতা, শিশুশ্রম, ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি কারণে বিদ্যালয়– বহির্ভূত ৮-১৪ বছর ১০ লক্ষ শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তাছাড়াও সরকার স্থায়িত্বশীল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে কমিউনিটির সকল শ্রেণির মানুষের সাক্ষরতা ও জীবনব্যাপী শিখন চাহিদা পূরণে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ১টি করে ও কিছু শহর এলাকায় ৫০২৫টি আইসিটি বেইজ্ড কমিউনিটি লার্নিং সেন্টার (সিএলসি) স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু গৃহীত কার্যক্রমসমূহ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নে কোভিড-১৯ মহমোরির বাঁধার সম্মুখীন হয়েছে। কোভিড-১৯ মহমোরিতে সাক্ষরতা এবং সাক্ষরতা সংশ্লিষ্ট গৃহীত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নে সম্ভাব্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

ই-লার্নিং কার্যক্রম পরিচালনা : মানুষের জীবনযাপনের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করা হলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সাক্ষরতা কার্যক্রম এখনও বন্ধ রয়েছে। এই করোনা সংকটকালে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় সমৃদ্ধ এবং মানসিক সহায়তায় ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে অনলাইনে ক্লাস বা ই-লার্নিং-ই অন্যতম কার্যকর পদ্ধতি। এ দিকে শিক্ষা ব্যবস্থায় উদ্ভাবিত হয়েছে অভূতপূর্ব ধারণা তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন কৌশল। যা জ্ঞানের ভাণ্ডাররূপে বিশ্বকে সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে। এই ই-লার্নিং বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের সুবিধা হচ্ছে-স্মার্টফোনের মাধ্যমে যেকোনো স্থান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। তাই কোথায়ও পড়াশোনা করতে হয় না। ঘরে বসেই তা সম্ভব।

বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তার ফসল 'ডিজিটাল বাংলাদেশ'। 'ডিজিটাল বাংলাদেশে'র সুযোগ ব্যবহার পূর্বক এখন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও ডিজিটাল শিক্ষা পৌঁছনো সম্ভব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তরুণদের প্রযুক্তিনির্ভর মানবসম্পদ বির্নিমাণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যার স্থপতি হিসেবে কাজ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পুত্র ও উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।

বাংলাদেশেও অনলাইন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়া শুরু হয়েছে। গুগল ক্লাসরুম কিংবা অন্যান্য অনেক সফটওয়্যার এবং হোয়াটসঅ্যাপ বা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপ খুলে ক্লাস পরিচালিত হচ্ছে। স্বল্প পরিসরে হলেও মৌলিক সাক্ষরতা ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ই-লার্নিং পদ্ধতিতে শিখন কার্যক্রম শুরু করা যায়।

অনলাইন শিক্ষায় ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান : কোভিড-১৯ মহমোরিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় সংযোগ স্থাপন এবং শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা সরকারের জন্য এক বড়ো চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে বাংলাদেশেও টেলিভিশন, ফেসবুক, গুগল অ্যাপ, জুম এবং অন্যান্য মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম হয়েছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের অনেকের টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, স্মার্টফোন না থাকায় তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। যার কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে অনলাইন শিক্ষার কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদ্যুতের বিঘ্নিত সরবরাহ অনলাইন শিক্ষার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধক। উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন শিক্ষা ব্যয়বহুলও। অনলাইন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট আর্থিক সক্ষমতা থাকা দরকার। এছাড়া অনেকের ইলেক্ট্রনিক সরঞ্জাম থাকলেও দুর্বল নেটওয়ার্ক ও নিম্নবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত অনেকের আর্থিক সামর্থ্যের অভাব রয়েছে। তাই অনলাইন শিক্ষার গৃহীত পদক্ষেপের সফল বাস্তবায়ন কিছুটা সংশয়ের মুখে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলায় অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম নির্বিঘ্ন করণে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের অধিকতর সরকার থেকে ফ্রি ইন্টারনেট দিতে পারলে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম অধিকতর বেশি কার্যকর হতে পারে।

পাঠ্যক্রম সংক্ষিপ্তকরণ : করোনা ভাইরাসের কারণে প্রায় বেশ কয়েক মাস যাবৎ শিক্ষাদান কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। এ দীর্ঘ সময়ের ক্ষতি পূরণে উঠে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে তাদের কোর্স শেষ করার জন্যে পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন। পাঠ্যক্রম– বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পাঠ্যক্রম সংক্ষিপ্ত করে এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারেন।

অনলাইন কোর্সের উপকরণ তৈরি ও সরবরাহ : অনলাইন কোর্স পরিচালনার নিমিত্তে চাহিদা অনুযায়ী শিখন উপকরণ তৈরি ও তা সরবরাহ করে শিখন কার্যকমে নির্বিঘ্ন করা যায়। কোর্স ম্যাটেরিয়াল নিয়মিত আপলোড পূর্বক শিক্ষার্থীদের শিখণের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর কিছু সাইড, তথ্য, সংক্ষিপ্ত ভিডিও নিয়মিত বিরতিতে প্রদান করা হলে শিক্ষার্থীরা সময় সুযোগমতো দেখে শিখতে পারবে। প্রচলিত শিখন উপকরণের পরিবর্তে ডিজিটাল উপকরণ তৈরি ও সরবরাহ এখন যুগের চাহিদা। এটি আর কল্পনা বিলাস নয়।

শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা : নতুন শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতিতে সম্পৃক্তকরণে সাক্ষরতা কার্যক্রমের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মীদের অনলাইন কোর্সের উপকরণের ব্যবহার বিষয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নতুন এ প্রেক্ষাপটে গতানুগতিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিহার করে উদ্ভাবিত নতুন মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তা সম্পন্নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

গৃহকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম : কোভিড -১৯-এর কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের শিশুদের গৃহকেন্দ্রিক শিক্ষা প্রদানে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন

করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিশুদের অধিকাংশ সময়ে বিদ্যুৎ এবং টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের মতো আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধাবিহীন অবস্থায় বাড়িতে বসে পড়াশোনা করা ছাড়া অন্য বিকল্প নেই। ফলে সেখানে শিশুদের গৃহভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমে বাড়িতে শিশুদের অর্থপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করণে পিতামাতাদের পরামর্শ রয়েছে। পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তু পরিমার্জিত করে শিশুদের জন্য সহজ এবং উপযোগী করা হয়েছে। শিক্ষকের ন্যূনতম সহায়তা নিয়ে বাড়িতে পিতামাতারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। গৃহভিত্তিক শিক্ষার প্যাকেজটিতে আবৃত্তি ও গানসহ শিশুদের দৈনিক নিয়মিত কার্যক্রমকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এ শিখন কেন্দ্র বন্ধ এবং অন্য শিক্ষক দিয়ে পড়ানোর সুযোগ না থাকায় শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে পড়াশোনা পরিচালনার ও তাদের গৃহে পড়ানোর জন্যে তাদের পিতামাতা বা পরিবারে পড়াতে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রস্তুত করে তুলতে হবে।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিখন : কোভিড -১৯-এর কারণে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (দৃষ্টি, শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীকে) সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এ ধরনের শিক্ষার্থীরা বিশেষ পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণে অভ্যস্ত এবং তাদের আলাদা শিক্ষক প্রয়োজন চলমান এ স্থবিরতা স্থূরীকরণের অংশ হিসেবে অনলাইন ক্লাসের দিকে অগ্রসর হলেও তাদের সমস্যাগুলো পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। এক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ সাপেক্ষে তাদের প্রয়োজনীয় যথাযথ শিক্ষা উপকরণ পৌঁছানো ব্যাতীত বর্তমানে কোনো দ্বিতীয় উপায় নেই। পাশাপাশি, বিশেষ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম ন্যূনতম আকারে হলেও পরিচালনার জন্য তাদের পিতামাতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

এনজিও উদ্যোগের সাথে সমন্বয় সাধন : কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সাক্ষরতায় নিয়োজিত অনেক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও নতুনত্ব সংযোজন করছে। শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদানের জন্য পরীক্ষামূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের কয়েকটি এলাকায় শিখন কেন্দ্রের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পিতামাতার মোবাইলে গ্রুপ কলের মাধ্যমে ৩-৪ জনের গ্রুপ করে ক্লাস পরিচালনা করছে। শিক্ষকরা মোবাইলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংঙ্ক, বাংলা, ইংরেজি পাঠসহ ছবি আঁকা এবং গল্প বলার মতো সহশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ সময়ে অনেক ছেলে শিক্ষার্থী পরিবারকে সাহায্য করতে কৃষিকাজে যোগ দেয়, মেয়েরা ঘরের কাজ শুরু করে। মোবাইলে ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে তাদের আবার পড়ালেখার রুটিনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। শিক্ষকগণ কোভিড-১৯ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ সামাজিক দূরত্ব এবং নিরাপত্তা বিষয়ক তথ্য পৌঁছে দেন। তারা স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষার্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস এবং শক্তি অটুট থাকে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি উদ্যোগের সাথে সমন্বয় পূর্বক তা দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারে।

স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী শিখন কেন্দ্রভিত্তিক কর্মসূচি পরিচালনা : বর্তমানে শিখন কেন্দ্রে যথাযথ স্বাস্থ্যসূচি মেনে পর্যাপ্ত দূরত্বে শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিশ্চিত করা যেতে পারে। শিখন কেন্দ্রে ঢোকার পূর্বে যথাযথভাবে জীবানুমুক্ত করে প্রবেশ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদির ওপর আলাদাভাবে বিধি-নিষেধ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে গুরুত্বারোপ করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সরাসরি সংস্পর্শের বাইরে থাকবে। পাশাপাশি সপ্তাহের ৬ দিনের পাঠদানে শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের ভাগ করে ৩ দিন করে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায়। শিক্ষক/শিক্ষিকা শিখন কেন্দ্রে পাঠবিহীন দিনে শিক্ষার্থীদের বাড়ির পাঠ দিতে পারেন। মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) ১১৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমকে এ পদ্ধতিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

গবেষনা সেল গঠন : করোনাকালীন সাক্ষরতা কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নে গবেষণামুলক কার্যক্রম পরিচালনা অতীব জরুরি। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় গবেষণা সেল গঠনের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগের সফলতা যাচাই, নতুন নতুন বাস্তবায়ন, মনিটরিং, মূল্যায়ন পদ্ধতি, কার্যক্রমের প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ ইত্যাদি বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক যুগোপযোগী কর্মপন্থা নির্ধারণ করা যেতে পারে। এখানে সরকার/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করে গবেষণা কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা যায়।

বাজেট বৃদ্ধি : করোনা মহামারিতে শিক্ষা খাতকে ডিজিটালাইজেনের করার জন্যে সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষাক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধি। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে পৃথকভাবে 'আপদকালীন বাজেট' অনুমোদন করা যেতে পারে।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে জাতিকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যার ধারাবাহিকতায় সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯৬–২০০১ সাল পর্যন্ত প্রায় এক কোটি ৮০ লাখ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয়। সাক্ষরতা অর্জন ও নবদিগন্ত প্রসারের জন্য ইউনেস্কো বাংলাদেশকে ১৯৯৮ সালে 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' প্রদান করে।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে নাগরিকদের সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। সাক্ষরতা, শিক্ষা ও উন্নয়ন উভয়ে ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। সাক্ষরতা মানুষকে কর্মক্ষম ও মানবসম্পদে পরিণত করে। সাক্ষরতা দক্ষতা, ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন, সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। দারিদ্র্য হ্রাস, শিশুমৃত্যু রোধ, সুষম উন্নয়ন এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি বিকাশের ক্ষেত্রে সাক্ষরতা অনন্য ভূমিকা পালন করে, এটি একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানসিক মনোবল বৃদ্ধিতেও সহায়তা করে। সুতরাং সরকারে সাক্ষরতা কার্যক্রমের মহতী উদ্যেগের সফল বাস্তবায়নে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনে সকলকে অগ্রসর হতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলার মানুষ সাক্ষরতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ জীবন গড়তে সক্ষম হবে। বাংলাদেশ পরিণত হবে সুখী, সমৃদ্ধ ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত সোনার দেশে। বাংলাদেশ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাড়াবে। প্রতিষ্ঠা লাভ করবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

দিলীপ কুমার সরকার
সহকারী পরিচালক
জেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, দিনাজপুর।

কোভিড-১৯ সংকট সমস্যা ও পারিবারিক সাক্ষরতার প্রয়োগ

সরোজ কুমার দাস

বর্তমান করোনা পরিস্থিতি সর্বক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিশেষকরে শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা মোকাবেলার জন্য চিন্তাভাবনাও শুরু হয়েছে খুব জোরেশোরেই। Education in Emergency বিষয়ে কাজ৪ করার অভিজ্ঞতা আমাদের দেশের শিক্ষা প্রশাসনের রয়েছে। কিন্তু করোনার এমনতর পরিস্থিতিতে কাজ করার অভিজ্ঞতা তো ছিল না। তাসত্ত্বেও বিশ্বের কোনো দেশই নিশ্চুপ নেই। সবাই শিক্ষার্থীদের জন্য করণীয় নির্ধারণ করছে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনও নানা উদ্যোগের বাস্তবায়ন করেছে। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ নিয়মিত অন-লাইন ক্লাস পরিচালনা বিষয়ে মনিটরিং অব্যহত রেখেছে। বেসরকারি ভাবেও বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। তারপরও কি সফলভাবে সকলকে এই উদ্যোগে সামিল হতে পারছি? সকল শিক্ষার্থী কারিকুলাম অনুযায়ী কি যথাযথ পাঠদানের অডিও-ভিজুয়াল সুবিধা পৌঁছে দিতে পারছি? নিশ্চয়ই না। অনেক শিক্ষার্থীই কর্মসূচির বাইরে থেকে যাচ্ছে। যার আবার যথার্থ কারণও রয়েছে। যেমন– তথ্য প্রযুক্তি বা মোবাইল সুবিধা সব শিশু পাচ্ছে না। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিবারের আর্থিক ও অন্যান্য সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আবার যোগাযোগ প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়। অনেক স্থানেই যথোপযুক্ত নেটওয়ার্ক নেই। শুধু তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অডিও-ভিজুয়াল সুবিধাই সাক্ষরতা অর্জনের জন্য একমাত্র উপায় নয়। তাই প্রয়োজন এক সমন্বিত কার্যক্রমের সুষম প্রচেষ্টা। এর জন্য সমস্যাসমূহের গতি-প্রকৃতি সঠিকভাবে বুঝতে পারা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আবার একথাও ঠিক যে, সমস্যার বিষয়গুলো সর্বত্র ও সবক্ষেত্রে একরকম নয়। UNESCO ইতোমধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণে সমস্যা ও বিরুপ ফলাফলের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করেছে। বিদ্যালয় বন্ধের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে সমাজ। এই ক্ষতির প্রভাব দরিদ্র ও অসুরক্ষিত পরিবারে ও তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বেশি পড়ছে। বিশেষকরে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও নানা নেতিবাচক দিক প্রতিফলিত হচ্ছে। UNESCO কর্তৃক চিহ্নিত ১২ টি বিরূপ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে-

ক. **বিঘ্নিত শিক্ষা :** স্কুল বন্ধ হলে শিশু ও তরুণরা বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। স্কুলের বাইরে যাদের শিক্ষার সুযোগ কম তারা অধিক অসুবিধাগ্রস্থ হয়।

খ. **দুর্বল পুষ্টি :** অনেক শিশু ও তরুণ খাদ্য এবং পুষ্টির জন্য স্কুলে বিনামূল্যে বা দ্বারকৃত খাবারের উপর নির্ভর করে। তাই স্কুল অপ্রত্যাশিত কারণে দীর্ঘমেয়াদে বন্ধ থাকলে তাদের পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেয়।

গ. **শিক্ষকদের জন্য বিভ্রান্তি ও চাপ :** অপ্রত্যাশিত ও অজানা সময়ের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষকমণ্ডলী বাধ্যবাধকতা ও শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে তাদের ছাত্রদের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তায় এবং চাপের সম্মুখীন হয়।

ঘ. **দূরত্ব ও হোম স্কুলের জন্য অপ্রস্তুত পিতামাতা :** বাড়িতে শিখন সুবিধায় করণীয় বিষয়ে অভিভাবকদের বলা হয়। কিন্তু অনেক অভিভাবক সীমিত সম্পদের কারণে অসুবিধা গ্রস্তত হন। এক্ষেত্রে বিশেষ করে তাদের নিজেদের স্বল্প সাক্ষরতা বা নিরক্ষরতাও সমস্যা সৃষ্টি করে।

ঙ. **দূরশিক্ষনের সুবিধা সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ :** শ্রেণিকক্ষ থেকে বাড়িতে শিখন পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত পরিস্থিতির উন্নয়ন বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া এক্ষেত্রে অধিক সমস্যা হলো প্রশিক্ষিত মানুষ ও টেকনিক্যাল অবকাঠামো ও লজিস্টিক সাপোর্ট।

চ. **চাইল্ডকেয়ারে শূন্যতা সৃষ্টি :** বিকল্প সুযোগের অভাবে কর্মরত পিতামাতা শিশুদের বাড়িতে একা ছেড়ে কর্মস্থলে যেতে বাধ্য হয়। আর স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুরা বাড়িতে অধিক সময় থাকায় অনেকটা অনিরাপদ অবস্থায় থাকে। তারা এসময় সমবয়সীদের সাথে ঝামেলা বা দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে।

ছ. **উচ্চ অর্থনৈতিক :** স্কুল বন্ধ থাকায় মা-বাবা অনেকসময় তাদের কাজ বন্ধ রেখে সন্তানের জন্য বাড়িতে থাকে। একারণে তাদের মুজুরি যেমন হ্রাস পায়, তেমনি উৎপাদনশীলতাও কমে যায়। এমনটা ব্যক্তি বা দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক নয়।

জ. **স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উপর অনিচ্ছাকৃত চাপ :** স্কুল বন্ধ হওয়ায় কারণে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী ডাক্তার বা কর্মীরা সহজে শিশুদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান না। ফলে শিশুদের শুধু সুস্থতাই নয় বরং শারীরিক ও মানষিকভাবে বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত হয়।

ঝ. **খোলা স্কুলের উপর চাপ বৃদ্ধি :** যখন স্থানীয়ভাবে কোথাও স্কুল বন্ধ এবং পার্শ্ববর্তী কোথাও খোলা রাখা হয় তখন খোলা স্কুলের ওপর চাপ পড়ে।

ঞ. **ড্রপ আউটের হার বৃদ্ধি :** দীর্ঘ বন্ধের পর শিশু ও তরুণদের স্কুলে ফিরে আসা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। কারণ অনেককেই আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করে।

ট. **সহিংসতা এবং শোষণের ক্রমবর্ধমান সংস্পর্শ :** স্কুল দীর্ঘদিনের জন্য বন্ধের কবলে তখন বাল্য বিবাহ বৃদ্ধি পায়। অনেকে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। শিশু গর্ভাবস্থা বৃদ্ধি পায়। শিশু শ্রম বৃদ্ধি পায়। এমনকি অনেক শিশুকে জংঙ্গীবাদে সম্পৃক্ত করা হয়।

ঠ. **সামাজিক বিচ্ছিন্নতা :** স্কুল সামাজিক কার্যকলাপ ও মানবিক মিথস্ক্রিয়ার কেন্দ্র। স্কুল বন্ধ হয়ে ফলে অনেক শিশু ও তরুণ সামাজিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যা শিক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে।

দ. **শিক্ষা পরিমাপ ও মুল্যায়নের চ্যালেঞ্জ :** নতুন শিক্ষাস্তরে বা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন বিষয়ে জটিলতা দেখা যায়। এতে একদিকে বৃদ্ধি পায় শিক্ষার্থী ও তাদের পরিবারের উপর চাপ তথা শিক্ষা প্রশাসনেরও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়।

এমতাবস্থায়, এই সমস্যা বা বিরূপ অবস্থা বিবেচনায় বাংলাদেশেও শিক্ষার জন্য কর্মপরিকল্পণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ইতিমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। অত্যন্ত আশার কথা এই যে, বর্তমান সরকার প্রধান জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার। ই-লার্নিং অবকাঠামো, আইসিটি শিক্ষা, আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা, যুবসমাজের জন্য আইসিটিভিত্তিক ভোকেশনাল শিক্ষা, পাঠ্যবইকে ই-বুকে রূপান্তর, মোবাইল ব্যাংকিং, ইউটিলিটি বিল প্রদানের নির্দেশাবলি, ই-কৃষি নীতি, গ্রামীন কানেকটিভিটি সংক্রান্ত নির্দেশাবলী, ডিজিটাল লাইব্রেরি অবকাঠামো তৈরি ও অ২র এর মাধ্যমে নানাবিধ শিখন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অনলাইন ভিত্তিক প্রচারণা বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। গৃহীত এই পদক্ষেপগুলোর কারণে আজকের এই কোভিড পরিস্থিতিতেও শিখন কার্যক্রম চালিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দু'টি জেলার চিত্র নিম্নরূপ :

	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য গৃহীত কার্যক্রম	
	রাজবাড়ি জেলা	**মাগুরা জেলা**
মাধ্যমিক শিক্ষা **মাধ্যমিক শিক্ষা**	শিক্ষক বাতায়নে নিবন্ধিত রাজবাড়ী অনলাইন স্কুল নামে একটি স্কুল ১৮ এপ্রিল, ২০২০খ্রি. থেকে চলমান। এখানে নিবন্ধিত ১২১ জন শিক্ষকের মধ্যে ৮৫ জন শিক্ষক নিয়মিত পাঠদান করছেন, পাশাপাশি উপজেলাগুলোতেও অনলাইন স্কুল চালু হয়েছে। রাজবাড়ি ক্যাবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমেও ধারণকৃত ক্লাস প্রচার করা হচ্ছে। জেলায় ৩১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ কন্টেট তৈরি করছেন। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম মনিটরিং করছেন।	মাগুরা জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক ১৭৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের উদ্যোগে অনলাইন শ্রেণি পাঠদান কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে চালু আছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন সংসদ টেলিভিশন প্রচারিত 'আমার স্কুল' অনুষ্ঠানের সাথে সকলকে সম্পৃক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত অনলাইন পাঠদান কার্যক্রম পরিবীক্ষণ অব্যাহত রেখেছেন।
প্রাথমিক শিক্ষা	রাজবাড়ি জেলায় মোট ২৭৮১ জন শিক্ষকের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৪১০ জন শিক্ষক অনলাইন পাঠদান পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছেন। আর শিক্ষার্থীদের তরফে ৭২৩৫১ টি অংশগ্রহণ হয়েছে অনলাইন / তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ক্লাসে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত অনলাইন পাঠদান মনিটরিং করছেন। বিভিন্ন লিংক ও ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে। Link: I Group https://www.facebook.com/shain.masud https://www.facebook.com/search/posts/	ঘরে বসে পাঠদান কার্যক্রম মনিটরিং করা হচ্ছে। একটি ইউটিউব চ্যানেল খুলে নিয়মিত পাঠ আপলোড করা হচ্ছে। হোম স্কুল পদ্ধতিতে ঘরে বসে বাটন মোবাইলে পাঠদান ও পাঠগ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসন নিয়মিত অনলাইন পাঠদান পরিবীক্ষণ করছেন। এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও শ্রেণি পাঠদানের বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

	কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার জন্য গৃহীত কার্যক্রম	
মাধ্যমিক শিক্ষা	**রাজবাড়ি জেলা**	**মাগুরা জেলা**
উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	রাজবাড়ি জেলাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চলমান কর্মসূচি নেই। পাংশা উপজেলায় ৩২০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯২০০ নিরক্ষরদের ৬ মাসব্যাপী পাঠদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোও ৩০০টি বই এর ই-বুক তৈরির কাজ প্রায় শেষ। বইগুলির সুবিধা অবশ্যই মাগুরা জেলা ও উপজেলা অফিসের মাধ্যমে লক্ষ্যদলের কাছে পঠনের জন্য পৌঁছে দেওয়া যাবে। ইতোমধ্যেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ICT ভিত্তিক self education I self training বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালায় রাজাবাড়ি জেলার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।	মাগুরা জেলাতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চলমান কর্মসূচি নেই। শ্রীপুর উপজেলায় ৩২০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৯২০০ জন নিরক্ষরদের ৬ মাসব্যাপী পাঠদানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মাগুরা জেলাতে সমাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ৩০০ জন শিক্ষার্থীর পরিবারে পারিবারিক সাক্ষরতার আওতায় কোভিড পরিস্থিতিতেও পরিবারগুলোতে সাক্ষরতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোও ৩০০টি বই-এর ই-বুক তৈরির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। বইগুলির সুবিধা অবশ্যই রাজবাড়ি জেলা ও উপজেলা অফিসের মাধ্যমে লক্ষ্যদলের কাছে পঠনের জন্য পৌঁছানো যাবে।

এখন প্রশ্ন হলো পারিবারিক সাক্ষরতার বিষয়টি কভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কিভাবে শিখন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে সক্ষম। প্যারেন্টিং স্কিল, হোম স্কুল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা শুনি, এগুলিও পারিবারিক সাক্ষরতার অনেকটা কাছাকাছি। ১৯৯৫ সালের দিকে এই পারিবারিক সাক্ষরতা (family Literacy) বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ শুরু হয়। এখন সেখানে পারিবারিক সাক্ষরতার জন্য আইন চালু হয়েছে। যুক্তরাজ্য, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, জাপান, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই পারিবারিক সাক্ষরতা নিয়ে কাজ চলছে। বাংলাদেশে ঐতিহ্যগতভাবে পারিবারিক সাক্ষরতা চর্চা প্রতিটি পরিবারেই হচ্ছে। প্রায় সব পরিবারেই বড়রা ছোটদের শেখায়। কিন্তু এটার জন্য কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচি আমাদের দেশে চালু নই। বাংলাদেশে সঠিক অবস্থা বিবেচনায় যদি পারিবারিক সাক্ষরতার আঙ্গিক ঠিক এবং পরিবারগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে বয়স্ক নিরক্ষরেরাও অনেক উপকৃত হবেন। আমরা জানি, আমাদের দেশে এখনও প্রায় ৩ কোটি নিরক্ষর রয়েছে। খুব সহজেই সব নিরক্ষরদের সাক্ষর করতে পারি। প্রায় প্রতিটি পরিবারেই স্কুল– পড়ুয়া শিশু আছে। ধরা যাক, একটি পরিবারে ৫ জন সদস্য আছেন। তন্মধ্যে পরিবারের

পিতা ও মাতা নিরক্ষর। কিন্তু ঐ পরিবারের একজন শিশু ৫ম শ্রেণির ছাত্র। এক্ষেত্রে ঐ ছাত্রটিই কিন্তু তার মা-বাবাকে পড়াতে পারে। আবার ঐ মা-বাবা নিরক্ষর হলেও তাদের অনেক ধরনের শিক্ষা আছে যেটা তারা সন্তানদের শেখাতে পারেন। ধর্মীয় জ্ঞান, সামাজিকতা, কৃষিকাজ, রান্নাবান্নাসহ অনেক কিছুই নিরক্ষর মা-বাবাদের থেকে শিখতে পারি। সুতরাং, পারিবারিক সাক্ষরতা অনুমোদন দেয় একটা মিশ্র দলের যেখানে থাকবে নিরক্ষর ও সাক্ষর ব্যক্তির সম্মিলন। কারণ নিরক্ষর ব্যক্তি সাক্ষর ব্যক্তির সান্নিধ্যে সাক্ষরতার সুযোগ পায়। আবার যদি কোনো উন্নয়ন প্রকল্পে অংশিদারিত্ব এবং সেখানে কেউ সাক্ষর সম্মত হয় তাহলে তিনিও দলের অন্যদের সাক্ষরতা প্রশিক্ষণে অনানুষ্ঠানিকভাবে অবদান সক্ষম। ১৯৯৭ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যুক্তরাজ্যে প্রশিক্ষণের সময় 'New Ideas about Iiteracy' বিষয়ে আমার একটি লেখা Education for All এর প্রকাশনা Orbit এ প্রকাশিত হয়, নিতান্ত প্রাসঙ্গিক বিধায় লেখাটির অংশবিশেষ নিম্নে উদ্বৃত করছি ।

'We see that nonliterate persons are capable of engaging in developmental task for themselves. They will be motivated to learn literacy when they see the real need for it to do the task in real situations. So first of all let them start with a developmental task and when the participants express the need to learn something, to read something and write something, then is the right time to encourage them with this need. One thing is very important here, that if we want to go through literacy-comes–second approach we shall be working with a mix group of literate and nonliterate people on some development task which they have set for themselves.'

পারিবারিক সাক্ষরতা কর্মসূচিসমূহ মূলত শিক্ষায় অভিগমন বা জড়িতকরণে সমন্বিত বা সামগ্রিকভাবে পরিচালিত কার্যাবলি। এই মাধ্যমে পিতা-মাতা ও সন্তানদের বৃদ্ধি ও শিখন একসাথে চলমান, অর্থাৎ দৈনন্দিন কার্যক্রমের মধ্যেই এই শিক্ষা চলমান। পারিবারিক সাক্ষরতা একটি পরিবারের সাক্ষরতা, শিক্ষা সক্ষমতা ও চাহিদাকে বিবেচনায় বয়স্ক ও ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় অধিক হারে সংশ্লিষ্ট করণে সচেষ্ট থাকে। এই বিশ্বাস থেকে যে শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের পিছনে বেশি প্রভাব বা ভূমিকা থাকে ওই পরিবারের বয়স্কদের এটি করা হয়। আবার বয়স্করাও সাক্ষরতা চর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ পায়। এই কর্মসূচি ও সন্তানদের মধ্যে যে পারস্পারিকতার বা মিথস্ক্রিয়ার বিষয়টি রয়েছে তা সবসময়ই মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে। পিতা-মাতা (বয়স্ক) ও শিশু উভয় পক্ষে কিছু কার্যাবলির প্রস্তুতি গ্রহণে ও সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে যাতে এইরূপ পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন এবং পিতা-মাতা ও শিশু উভয়ই শিখনের জন্য উদ্বুদ্ধ বা প্রয়োজন অনুভব করে। একটি পরিবারের শিক্ষার সুযোগসমূহের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রারম্ভিক শৈশবকালীন শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার মধ্যে একটা সমন্বয়ের মাধ্যমে শিক্ষার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও পারিবারিক সাক্ষরতা কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য।

বর্তমানে উদ্ভাবন সংস্কৃতির এক বিশেষ পর্যায়ে অবস্থান করছি। বাংলাদেশে প্রতিটি দপ্তরের মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ বা সেবার মান উন্নয়নে অব্যাহত প্রচেষ্টা করেছে। কিছু উদ্ভাবন খুব সহজেই দৃষ্টিগোচরে হয়, যেমন অবকাঠামোগত পরিবর্তন বা পরিবর্ধন। এছাড়া কিছু উদ্ভাবন খুব সহজেই দৃশ্যমান যেমন আগে পাসপোর্ট পেতাম ২৫ দিনে এখন পাই ৭ দিনে। কিন্তু কিছু পরিবর্তন খুব সহজে দৃশ্যমান, তাছাড়া সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রের গবেষণা স্বল্পতার জন্যও বিষয়গুলো সঠিক সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হয়। কারণ শিক্ষাক্ষেত্রের কোন শ্রেণির কত জনের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনের হার কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে বা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমে বিনোদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে কতটা বা মানসিক ও শারীরিক বিকাশ, কতটা হয়েছে তা নির্ধারণকল্পে আমাদের গবেষণা আশাব্যঞ্জক নয়। আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণা নেই বললেই চলে। আশার কথা, মাগুরা জেলায় পারিবারিক সাক্ষরতা উদ্ভাবন প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩০০টি পরিবারে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছে। বয়স্ক নব্যসাক্ষরদের সাক্ষরতা টেকসইকরণে,

পরিবারের আয়বৃদ্ধিসহ জীবনমানের সূচক ও পারিবারিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। মাদক, ইভটিজিং, বাল্যবিবাহ, সন্ত্রাস, আত্মহত্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে অনেক সুফল মিলেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে পারিবারিক সাক্ষরতার প্রয়োগ আমাদের সাংবিধানিক ও অন্যান্য প্রতিশ্রুতি পূরণে অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্র	প্রতিশ্রুতির বর্ণনা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান	১৭. রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য;
	(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য;
	(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বাংলাদেশকে সম্পূর্ণভাবে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা হবে। প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। গত এক দশকে প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার শতকরা ২০ ভাগের নিচে নেমে এসেছে। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ঝরে পড়ার হার শতকরা ৫ ভাগে নামিয়ে আনা হবে।
SDG 4.	Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

কোভিড সংকট : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া ও শিক্ষাকর্মীদের ভূমিকা

তপন কুমার দাশ

স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালেই পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়। এ সময়েই জাতির জনকের নির্দেশে দেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে সমবায় আন্দোলন শুরু হয়। দেশব্যাপী বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেসরকারি উদ্যোগেও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বয়স্ক শিক্ষার মূল দর্শনই ছিলো মানুষকে জোটবদ্ধ করা। বলা হয়, জোটবদ্ধভাবেই মানুষ প্রতিদিন সাক্ষরতা কেন্দ্রে আসবে ও লেখাপড়া করবে। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করবে।

যার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে একজন সাক্ষরতা– কর্মী হিসেবে আমরাও মানুষকে প্রতিনিয়ত উদ্দীপ্ত করেছি দলবদ্ধ, সাক্ষরতা অর্জন, সমিতি গঠন, আর নিয়মিত দলীয় সভায় সম্মিলনে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে।

ফিলিপিনো সমাজ গবেষক জেমস্ ইয়েনের 'গো টু দ্য পিপল, লিভ এমং দেম' ভাবধারাকে অনুসরণের আমরা তখন প্রতিদিন, প্রতিরাতেই দরিদ্র মানুষদের নিয়ে দলীয় আলোচনায় বসতাম। তাদের সঙ্গে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতাম। পাওলো ফ্রেইরি'র শিক্ষা দর্শনের মূলকথা ছিল, 'মানুষকে জাগাও, তাকে সচেতন করো, নিস্তব্ধতার অচলায়তন ভেঙে মানুষকে মুক্ত করে আনো'।

এসব তত্ত্ব বা নির্দেশনাকে কাজে লাগিয়েই আমরা অব্যাহত সভা-সমাবেশ, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সাক্ষরতা কেন্দ্র সংগঠিত করতাম নিরবচ্ছিন্নভাবে আমাদের তত্ত্বাবধান প্রক্রিয়া চলতো। এমন কোনো সাক্ষরতা বা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র নেই যেখানে সপ্তাহে দু'একবার সুপারভাইজার, কিংবা অন্য কোনো কর্মকর্তা যান না। মূলত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সমাজের লোকজন, শিক্ষা উন্নয়ন কর্মী/কর্মকর্তাদের যুগপৎ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই বয়স্ক শিক্ষা পরিচালিত হয়।

বয়স্কদের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষার একটি অন্যতম কনটেন্ট বা বিষয়ও হচ্ছে দলীয় কার্যক্রম সংগঠন ও পরিচালনা। এ শিক্ষা লব্ধ বয়স্ক সাক্ষরতা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা দল গঠন, সঞ্চয় সমিতি গঠন, পুঁজি তৈরি, আয়বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণ মাধ্যম সম্নত করে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম ও নানা ধরনের প্রশিক্ষণ।

এক্ষেত্রে ফেইস টু ফেইস ইন্টার‍্যাকশনের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এজন্য গড়ে তোলা হয় নারী এবং পুরুষ শিক্ষার্থীদের নিয়ে সাক্ষরতা বা শিক্ষা কেন্দ্র, সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা জীবনব্যাপী শিক্ষা কেন্দ্র। এ কেন্দ্রে আসার জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। সবার সঙ্গে মিলিত হওয়া ও মতবিনিময় অন্যতম লক্ষ।

এটাই বয়স্ক শিক্ষার মৌলিক কর্ম-কাঠামো বা রূপরেখা ; বাংলাদেশ এ রূপরেখা উন্নয়নের জন্য বিগত প্রায় আটচল্লিশ বছর ধরে শত শত শিক্ষাকর্মী কাজ করেছে। ইউনেস্কোসহ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থাও এসব কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছে। ফলে বয়স্ক শিক্ষার সামগ্রিক তরান্বিত হয়েছে।

কোভিড ১৯ সংকট :

কোভিড মহমোরির কারণে বয়স্ক শিক্ষার এই ফেইস-টু-ফেইস ইন্টার‍্যাকশন প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে করে স্তব্ধ হয়ে গেল নিস্তব্ধতার অচলায়তন ভেঙে মানুষকে মুক্ত করবে একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়া। ২০২০ সালের, জানুয়ারি-মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সোশ্যাল আইসোলেশন-এর ধারণা প্রায় নির্দেশ আকারে বিশ্বজুড়ে জারি হলো। বাংলাদেশেও গেল স্কুল-কলেজসহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাক্ষরতা বা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বা সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে হয়ে।

তবে করোনা ভাইরাসের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাবিদদের অব্যাহত সুপারিশ এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা বিবেচনায় সম্প্রসারিত হলো অনলাইন টিচিং প্রক্রিয়া। বাংলাদেশেও প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত অনলাইন টিচিং-এর আওতায় এলো। শিক্ষার্থীদের অনেক ঘরে বসে শিক্ষকদের থেকে পাঠভিত্তিক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়। কিন্তু, বয়স্ক শিক্ষার শিক্ষার্থীরা উপেক্ষিত হয়।

যদিও কোভিড সম্পর্কিত সচেতনতা বিকাশী কার্যক্রমের প্রথম ও উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠীই হচ্ছে যুবশ্রেণি এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা। কোভিড কী, কীভাবে ছড়ায় এবং এ সংক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রভিত্তিক সচেতনতা বিকাশমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে অনায়াসেই সচেতন করা যেত।

এ বিষয় ইউনেস্কোসহ অনেক আন্তর্জাতিক বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রথম থেকেই উপলব্ধি করেছে। এ লক্ষ্যে এপ্রিল '২০ থেকেই ধরনের ভার্চুয়াল মিটিং আয়োজিত হয়েছে নানা। ইউনেস্কো কর্তৃক এ সময়ে এশিয়া ইউরোপের নানা দেশে কোভিড সময় বা করোনাকালে বয়স্ক শিক্ষার প্রক্রিয়া কনটেন্ট প্রক্রিয়ার পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়নসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা প্রগতি বিষয়ে, সিরিজ আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। ভারতের 'প্রিয়া' এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বয়স্ক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক নানা ভাষায় রিজিওনাল ও ইন্টারন্যাশনাল ভার্চুয়াল আলোচনা হয়েছে।

এসব আলোচনায় স্পষ্ট যে, লক-ডাউনের কারণে হয় বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই ড্রপ আউট হয়ে যাবে। তাদের উন্নয়ন অভিযাত্রা। তারা পুনরায় চরম দারিদ্র্যের আবর্তে নিপতিত হবে।

ইতোমধ্যেই ইউনেস্কো, আইএলওসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো প্রক্ষেপণ করেছে যে, কোভিডের কারণে প্রায় ৭০ ভাগ শিক্ষার্থীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে এদের মধ্যে অনেক শিক্ষার্থীই হয় বিদ্যালয়ে ফিরতে সক্ষম হবে না। যদিও নানা দেশেই লকডাউন চলাকালীন বা ছুটি কালীন নানা ক্ষেত্রেই অন লাইন কোর্স চালু করা হয়েছে। কিন্তু, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যমান শিক্ষা উপকরণ, শিক্ষক বা প্রশিক্ষকদের ভার্চুয়াল পদ্ধতি ব্যবহারে অপরিপক্কতা বা শিক্ষার্থীদের অসামর্থ্য ইত্যাদি কারণে অনেক শিক্ষার্থীই এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। ইতোমধ্যেই গণসাক্ষরতা অভিযানের এক জরিপে বলা হয়েছে, কোভিড-ডর কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ড্রপ আউট প্রবণতা, বেকারত্ব, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে অন্তর্ভুক্তি, বাল্যবিবাহ, অসামাজিক ও সমাজবিরোধী কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যান্য অনেক গবেষণাতেই দেশে হতদরিদ্র মানুষের হার বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা ব্যক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই গার্মেন্টস্ সেক্টরের সমস্যাসমূহ আলোচনায় এসেছে। তবে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী, হোটেল রেস্তোরার কর্মীসহ অপরাপর অসংখ্য ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণি বা গোষ্ঠীর প্রসঙ্গটি বিবেচনা করা প্রয়োজন। বিবেচনায় আনতে হবে দেশে বিদ্যমান প্রায় ২৫ লাখ গৃহশ্রমিকের প্রসঙ্গটি। গৃহশ্রমিকের প্রায় আশি ভাগই নারী এবং তাদের অধিকাংশেরই বয়স বিশ বছরের কম।

সাক্ষরতার পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া :

উপর্যুক্ত পরিস্থিতি বিবেচনায়, বিশেষ করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতানুসারে কোভিডের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের বিবেচনায় আমাদের উচিত হবে যে কোনো পরিস্থিতিতে মানবমুক্তির দিশারী সাক্ষরতা বা বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এজন্য সামগ্রিক পরিকল্পনাকে যুক্ত করে বিন্যস্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্রই এ পরিবর্তন আনতে হবে। আর এ জন্য নীতি নির্ধারক, পরিকল্পক, বাস্তবায়নকারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সমাজের জনগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা কেন্দ্র :

- প্রথমেই ভাবতে হবে, করোনা কিংবা অন্য কোনো দুর্যোগে কীভাবে আমরা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে সর্বদা চালু রাখতে পারি।

- প্রথমত : শিক্ষাকেন্দ্রের পরিসর প্রশস্ত করতে হবে। সামাজিক দূরত্ব মেনেই যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠগ্রহণ করতে পারে সে জন্য প্রয়োজনে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২০ বা ২৫ মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাতে মাস্ক, হাত ধোরার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য নিরাপত্তামূলক উপকরণসমূহ নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিধান পূর্বক সুপারভাইজারদের নিয়মিত শিক্ষা কেন্দ্রে আসার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হবে।

- দ্বিতীয়ত: মহমোরির বিস্তৃতির কারণে শিক্ষা কেন্দ্র বন্ধ হলে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই যাতে পাঠ নিতে পারে সেজন্য কমিউনিটি রেডিও, জাতীয় বেতার সম্প্রচার ব্যবস্থা, সামাজিক মাধ্যম, এমনকি টেলিভিশনের মাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে। শিক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং বাস্তবায়নকারী এনজিও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবেন।

- তৃতীয়ত : প্রতিটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রকেই অন-লাইন নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষা কেন্দ্রকে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে কেন্দ্রে বসেই জাতীয়ভাবে প্রচারিত বা সামাজিক মাধ্যম থেকে ডাউনলোড পূর্বক পাঠ নিতে পারে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের কম্পিউটার ব্যবহারে সক্ষম হওয়া প্রয়োজন। পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের এ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

- চতুর্থত : বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোকে সামগ্রিকভাবে 'জীবনব্যাপী শিক্ষা'র একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এলাকাভিত্তিক জীবনব্যাপী শিক্ষার স্থায়ী কাঠামো উন্নয়ন পূর্বক বয়স্ক শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা, বিনোদনমূলক শিক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রমকে একই প্রতিষ্ঠানের আওতা করতে হবে। এজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি, এনএফই ফ্রেমওয়ার্কে নির্দেশিত স্থানীয় সরকার কাঠামোর সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই সামগ্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

সাক্ষরতা শিক্ষার বিষয়সূচি :

কোভিড মহামারির কথা বিবেচনায় সাক্ষরতা শিক্ষায় কোভিড মহমোরি সম্পর্কে অধ্যায় যুক্ত করতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রেই একটি বিশেষ 'মহামারী সচেতনতা পাঠ' শীর্ষক বুকলেট তৈরি এবং সকল শিক্ষা কেন্দ্রে বিতরণ করতে হবে। শিক্ষাক্রমে পর্যায়ক্রমে কোভিড-১৯ বা মহামারী বিষয়ক বিশেষ কনটেন্ট যুক্ত করতে হবে। সে অনুসারে নৈমিত্তিক পাঠ্যসূচিতে মহামারি বিষয়ক পাঠমালা যুক্ত করতে হবে।

পরিবর্তনশীল সাক্ষরতা কর্মীদের প্রশিক্ষণ :

ইতোমধ্যেই পৃথিবীব্যাপী আয়োজিত সভা-সেমিনারে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন-লাইননির্ভর শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার জন্য শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কদের যোগ্যতা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। বলা হচ্ছে, টেকনোলজি ব্যবহারে সক্ষম ও যথাযোগ্য শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের বেতন বা ভাতার উচ্চতর স্কেল প্রদানে এবং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল দক্ষতা নবায়নের ব্যবস্থা এবং অব্যাহতভাবে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখতে হবে, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরাই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগ রক্ষা এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করতে পারে। এটা পুরোপুরিই শিক্ষকসহ শিক্ষাকর্মীদের উপর নির্ভরশীল।

জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দ :

কোভিড মহমোরি বিবেচনায় সাক্ষরতা শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তনে জাতীয়ভাবে কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এখনও দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ অনলাইনে অভ্যস্ত নয়। তাই নবতর এ পদ্ধতি তাৎক্ষণিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এজন্য ধাপে ধাপে কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে। অন্যদিকে ডিজিটাল পদ্ধতির প্রবর্তনে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ডিজিটাল পদ্ধতির প্রতিস্থাপন ব্যবস্থা ব্যয়বহুল। তবে এতে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় ব্যয় হ্রাস পাবে। এজন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

সফলতার উদাহরণ :

বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষায় ডিজিটাল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রেই এ পদ্ধতি ব্যবহার পূর্বক শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ল্যাপটপও বিতরণ করা হয়েছে।

পাশাপাশি সেভ দ্য চিলড্রেন, গণসাক্ষরতা অভিযান ও ফ্রেন্ডশিপ-বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়নাধীন 'শিক্ষার মাধ্যমে কন্যাশিশুর ক্ষমতায়ন' প্রকল্পের আওতায় দেশের ২টি জেলায় পিছিয়ে পড়া ৩য়-৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ট্যাব' বিতরণ করা হয়েছে। এই ট্যাব ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন বাংলা, গণিত ও ইংরেজিতে দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পাচ্ছে। অন্যদিকে স্কাইপি-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অপেক্ষাকৃত সুনাম অর্জনকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ব্যবস্থা দেশেই সম্প্রসারণ করা যেতে পারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি এ ধরনের ডিভাইস দেওয়া যেতে পারে।

উপসংহার : এবারের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২০-এর মূল আলোচনাই হবে শিক্ষার্থীদের, বিশেষকরে যুবসমাজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে আনা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন করা। ইউনেস্কোর এক আলোচনায় বলা হয়েছে, সর্বাগ্রে প্রয়োজন কোভিড ১৯-এর স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবের মাত্রা নির্ধারণ এবং এ তিন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত : কোভিড পরিস্থিতিতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবনী কার্যাবলির তথ্য সন্নিবেশন এবং তা বিতরণের ব্যবস্থা করা।

সাক্ষরতা শিক্ষায় এ ধরনের পরিবর্তন আনয়নের উদ্যোগ ত্বরান্বিত করতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদেরকে সাক্ষরতা শিক্ষাকে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বিত করে বিশেষভাবে সাজাতে হবে। এখনই পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহারের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে।

এ লক্ষ্যে সর্বস্তরে কর্মরত সাক্ষরতা কর্মীদের অগ্রসর হতে। কোভিড ১৯ সংকটকালীন কিংবা পরবর্তী সময়ে পরিবর্তনশীল সাক্ষরতা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সাক্ষরতা কর্মীদেরকে গ্রহণ করতে হবে।

তপন কুমার দাশ
উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

করোনা–পরবর্তী বিশ্ব মানবজাতিকে নতুন জীবনধারা ও নতুন সাক্ষরতার বার্তা দিচ্ছে

মাছুম বিল্লাহ

প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়। এবারের প্রতিপাদ্য হে --'কোভিড-১৯ সংকট: সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা'। সাক্ষরতা, শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহনচ্চা এখন শুধু খাতা, কলম, বোর্ড, পড়তে পারা, লিখতে পারার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, কভিড-১৯ এক নতুন বিশ্বের চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আমরা দেখতে পাচিছ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নিভৃত পল্লীর শিক্ষক থেকে শুরু করে ব্যস্ততম ঢাকার শিক্ষকগণও বিভিন্ন ডিভাইসের মাধ্যমে মিটিং করছেন, ক্লাস পরিচালনা করছেন, কেউ কেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নও করেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই জীবনে এই প্রথমবার গুগলমিট, হ্যাংউট, জুম ইত্যাদির ব্যবহার শিখেছেন। এটি নতুন ধরনের সাক্ষরতা, নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা।

বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সাক্ষরতার ভূমিকা ব্যাপক, এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার। ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এমনকি শিক্ষার সুযোগের বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে সাক্ষরতার ওপর। সাক্ষরতা হচেছ মৌলিক শিক্ষার ভিত্তি। ১৯৬৭ সালে ইউনেস্কো প্রথম সাক্ষরতার সংজ্ঞা দিলেও প্রতি দশকেই এই সংজ্ঞা পাল্টাতে হয়েছে, এটিই স্বাভাবিক। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো এই সংজ্ঞাটি নির্ধারণ করে যে, ব্যক্তি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোট বাক্য পড়তে পারবে, সহজ ও ছোট বাক্য লিখতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাব নিকাশ করতে পারবে। কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও এখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তার প্রমাণ আমরা কোভিড পরিস্থিতিতে পেয়ে গেছি। একজন ব্যক্তি ভালভাবে বাংলা পড়তে পারলেন, সাধারণ যোগ-বিয়োগ পারলেন কিন্তু এই কভিডকালীন উপরিল্লোখিত ডিভাইসগুলোর সাথে পরিচিত নন, ব্যবহার করতে জানেন না, তাকে আমরা এই পরিস্থিতিতে সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন বলব কিনা তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। একজন মানুষকে সাক্ষর বলা মানে তাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা যে, বর্তমান যুগের সাথে তিনি তাল মেলাতে পারছেন। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তিনি পারছেন না, কাজেই সাক্ষরতার সংজ্ঞা পাল্টে যাবে, আমাদের জীবন পাল্টে গেছে, শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিও অনেকটাই পাল্টে গেছে। আরও একটি বিষয় এখানে চলে আসে, সেটি হচেছ বৈশ্বিক এই প্রেক্ষাপটে শুধু নিজের দেশের ভাষায় যদি একজন লোক সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হন, তাতে কিন্তু গ্লোবাল ভিলেজের নাগরিক হিসেবে প্রকৃতঅর্থে তিনি সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন নন। কারণ যেসব প্রয়োজনীয় তথ্য একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সেটি স্বাস্থ্য সম্পর্কিতই হোক আর নিরাপত্তা সম্পর্কিতই হোক তাকে কিন্তু জানতে হচেছ আর সেটি জানার জন্য একটি গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজের সাথে পরিচিত তাকে হতে হচেছ। যেমন এখন ফেসবুক, ইউটিউব, মেসেঞ্জার ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে যা কিছু শেয়ার করা হয় সেই সাক্ষরতা কিন্তু ইংরেজিতেই করতে হয়। শুধু বাংলায় করলে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী কিংবা রিজিয়ন কিংবা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই সাক্ষরতার সংজ্ঞা এখন ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে বাধ্য।

সাক্ষরতা সমাজে শান্তি স্থাপনে অবদান রাখে, মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করে। এর সাথে এখন যুক্ত হচেছ, সাক্ষরতার মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ করার দক্ষতাটিও। কোথায় কোভিডের উৎপত্তি হলো, কিভাবে তা দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়ালো, কিভাবে মানুষ আক্রান্ত হয়, কিভাবে এ থেকে নিজকে, পরিবারকে রক্ষা করা যায়– এ সবই আমরা জানতে পারছি অনলাইনে। যে সব ডিভাইস আমাদের অনলাইনে যুক্ত করছে সেগুলোর সাথে পরিচয়, সেগুলোর ব্যবহার এখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। গোটা পৃথিবীতে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৭০ শতাংশ মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযুক্ত । তরুণদের

মধ্যে এ হার আরও বেশি, প্রায় ৯০শতাংশ। বাংলাদেশে যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ মানুষের রয়েছে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। ১৩ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি অন্তত একটি সামাজিক যোগাযোগ প্রোফাইল রয়েছে। তারা দিনে দুঘন্টার বেশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যয় করে। ছাত্র-শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিশু-কিশোর, গৃহিনি, পেশাজীবী এদের বেশি-রভাগেরই এখন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের জরিপ অনুযায়ী ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চল মিলিয়ে প্রায় ২ কোটি ২০ লাখ মানুষ সক্রিয়ভাবে ফেসবুক ব্যবহার করছে (বণিকবার্তা, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৭)। বিশ্বব্যাপী ইউটিউব ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা ১৫০ কোটি, হোয়াটসঅ্যাপ ১২০ কোটি ফেসবুক মেসেঞ্জার ১২০ কোটি ও উইচ্যাট ব্যবহারকারী ৯৩ কোটি ৮০ লাখ (আগস্ট ২০১৭ সূত্র ইন্টারনেট) আমরা ফেসবুক ব্যবহার করছি কেন? এর উত্তর খুব সহজ। অলস দেহে সোফায় বসে কিংবা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে, শীতের রাতে কাঁথা কম্বলের মধ্যে লুকিয়ে ফেসবুকে চাপ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি কানাডা কিংবা অস্ট্রেলিয়ার কোন বন্ধু কি করছেন, সেখানকার আবহাওয়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, আমেরিকায় রাস্তায় কি হচ্ছে ইত্যাদি থেকে শুরু করে দেশের কোন জেলায় কি হচ্ছে, রাজধানীর কোন এলাকায় কি হচেছ, কোন সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে কেন পড়েছে, কিভাবে ধরা পড়েছে, কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধবের কি কি সুসংবাদ এসেছে, কি কি দুঃসংবাদ হলো সবই এখন হাতের মুঠোয় দেখতে পাচ্ছি ফেসবুকের কল্যাণে।

এ বিষয়গুলোকে সাক্ষরতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ধরে নিলে সাক্ষরতার হার কত হবে সে হিসেব নিশ্চয়ই আমাদের কোথাও সেভাবে নেই। প্রচলিত অর্থে দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা তিন কোটি ২৫ লাখ। তার অর্থ দাঁড়ায় শতভাগ সাক্ষরতা থেকে আমরা এখনও অনেক দূরে অবস্থান করছি। প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী বৈশ্বিক হিসেবে এখনও ২৬ কোটির বেশি শিশু-কিশোর স্কুলে যায় না এবং প্রায় ৬২ কোটি মানুষ সাক্ষরতা ও হিসাব-নিকাশে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। অথচ বিশ্বে প্রতিবছর কত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হয় মারণাস্ত্র তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে। আর দুবাইয়ের বাসিন্দা যাদের মধ্যে প্রতি পাঁচজনে একজন কোটিপতি; তারা বিলাসী জীবনের পাশাপাশি বন্য হিংস্র জন্তু জানোয়ার নিজেদের দশ কোটি থেকে একশত কোটি টাকা দামের গাড়িতে নিয়ে বেড়ায়, নিজেদের ড্রইং রুমে বাঘ, ভল্লুক আর শিম্পাজী পুষে। অথচ কোটি কোটি শিশু শুধু দারিদ্র্যের কারণে এখনও নিজ নিজ দেশের বর্ণমালার সাথেই পরিচিত নয়। এই বৈপরীত্য মোকাবিলা করার মতো নেতৃত্ব বিশ্বে প্রয়োজন। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ৪ নম্বরে। এখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এতে ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথাও বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জিত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাজটি সহজে হয়ে যেতে পারে।

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত মানুষদের সাক্ষরতা দানের উদ্দেশ্যেই ৮ সেপ্টেম্বর সাক্ষরতা দিবস পালিত হয়ে আসছে। এর সূত্রপাত হয়েছিল সেই ১৯৬৫ সালের ৮-১৯ সেপ্টেম্বর ইরানের রাজধানী তেহরাণে বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলনে। ১৯৬৬ সালে দিবসটি ইউনেস্কো প্রথম উদযাপন করে এবং আমাদের দেশে সেটি ১৯৭২ সালে পালিত হওয়া শুরু হয়। ১৯৯১ সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৫ দশমিক ৩ শতাংশ। এ সময় দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে' সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বা ইনফেপ নামে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। তারপর ২০০১ সালে সাক্ষরতার হার বেড়ে দাঁড়ায় ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্পটি ২০১৪ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের অনুমোদন পেয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতা প্রদান এর উদ্দেশ্য। তবে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতভাগ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনার প্রচেষ্ঠা অব্যাহত রয়েছে। দেশে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝড়েপড়া শিক্ষার্থীদের সেকেন্ডচান্স হিসেবে দশলাখ শিশুকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া শেখানোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৭ সালে পাইলটিং হিসেবে ছয় উপজেলার এক লাখ শিশুকে এর আওতায় আনা হয়েছে। পরে ২৫০ উপজেলা ও ১৫ টি শহরে পর্যায়ক্রমে আরও ৯ লাখ শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। এগুলো সবই শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের প্রচেষ্টারই অংশ।

করোনাকালে বিশ্বের ১৮৫টি দেশের ১৫৪ কোটি ২৪ লাখ ১২ হাজার শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে যেতে পারছে না। তাদের জীবনে এর প্রভাব হবে দীর্ঘমেয়াদি। এর মধ্যে চীনে সবচেয়ে বেশি শিশু-কিশোর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওই তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। চীনে ২৩ কোটি ৩০ লাখ এবং বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ কোটি শিশু স্কুলে যাচ্ছেনা। এই তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে আছে ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তান। বাংলাদেশে সেই ১৭ মার্চ থেকে সকল ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। শুরু হয়েছে ভার্চুয়াল ক্লাস অর্থাৎ বিকল্প উপায়ে পাঠদান, যদিও এটি কোনভাবেই সরাসারি পাঠদানের বিকল্প নয়। ব্র্যাক তার নিজস্ব উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের বইয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। এভাবে কোভিড-১৯ মহমোরি বিশ্বব্যাপী প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্নির্মাণ করছে। জেনেভাভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম বলছে, চীনের প্রায় বার কোটি শিক্ষার্থী সরাসরি টেলিভিশন সম্প্রচার থেকে বাড়িতে বসেই তাদের শেখার উপাদানগুলো পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি শীর্ষস্থানীয় শিক্ষামূলক উদ্ভাবক মিনার্ভা প্রজেক্টের কর্মকর্তা গ্লোরিয়া ট্যাম বলেন, 'করোনাভাইরাসের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্তগুলো লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে অস্থায়ী হোম স্কুলিংয়ের পরিস্থিতিতে নিয়ে গেছে। বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ইতালি ও ইরানের মতো প্রবল আকারে ভাইরাস প্রভাবিত দেশগুলোকে। এ পরিবর্তন অবশ্যই কিছুটা অসুবিধার কারণ হয়েছে। তবে শিক্ষার নতুন এ উদ্ভাবনকে আমরা উৎসাহিত করছি।' লকডাউন অঞ্চলের বেশির ভাগ বিদ্যালয় শিক্ষা প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল এবং বলা যায় একমাত্র সমাধান ডিজিটাল শিখন প্রক্রিয়া। তবে এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার গুণগত মান ও ডিজিটাল অ্যাকসেস-এর বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের ডিজিটাল অ্যাকসেস রয়েছে। এটিই হচ্ছে ডিজিটাল শিখন প্রক্রিয়ার বড় বাধা কারণ চল্লিশ শতাংশকে আমরা ছুঁতে পারছি না ডিজিটাল শিখনের আওতায় আনতে পারছি না। স্বল্পোন্নত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা লাইভ ক্লাস করতে না পারলেও সেগুলো হোয়াটসঅ্যাপ বা ই-মেইলের মাধ্যমে চালাচালি করে শিখন প্রক্রিয়াটা এগিয়ে নিচ্ছে। তারপরও ডিজিটাল অ্যাকসেসে এগিয়ে থাকা পরিবারগুলোর শিক্ষার্থীদের তুলনায় ডিজিটালি পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল ডিভাইস ও ডাটা প্ল্যানের ব্যয় মেটাতে না পেরে অনেক শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে ঝরেপড়ার আশঙ্কাও রয়েছে আর ঝরে পড়া মানে সাক্ষরতা থেকে দূরে চলে যাওয়া। তাই পুরো বিশ্বের ডিজিটাল অ্যাকসেস ব্যয় হ্রাস ও ডিজিটাল সেবার গুণমান বৃদ্ধি করা না হলে শিক্ষার মানের ব্যবধান এবং একইভাবে আর্থসামাজিক সমতার ব্যবধান আরো বেড়ে যাবে। আর এতে ডিজিটাল বিভাজন চরম আকার ধারণ করতে পারে। হংকংয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রকাশক, মিডিয়া, বিনোদন শিল্পের পেশাদার ভিডিও, বই মূল্যায়নের সরঞ্জাম ও ঘরে বসে শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ৯০০টি প্রতিষ্ঠান শিক্ষাগত উপকরণ সরবরাহ করতে একত্রিত হয়েছেন। এটি সাক্ষরতা ধরে রাখা থেকে শুরু করে শিক্ষার মানে পজিটিভ প্রভাব ফেলবে। এ ধরনের উদ্যোগ দেশে দেশেই হওয়া প্রয়োজন, যা নতুন বিশ্বব্যবস্থায় সাক্ষরতা বৃদ্ধিকে তরান্বিত করবে।

মাছুম বিল্লাহ
ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত সাবেক ক্যাডেট কলেজ, রাজউক কলেজ ও বাউবির শিক্ষক এবং বাংলাদেশ ইংলিশ ল্যাংগুজে টিচার্স এসোসিয়েশনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। শিক্ষা ও ভাষা সংক্রান্ত বেশ কিছু গ্রন্থেরঝ লেখক।
মোবাইল: ০১৭১৪-০৯১৪৩১
ইমেইল : masumbillah65@gmail.com

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় আহ্ছানিয়া মিশনের করোনাকালীন নানা পদ্ধতির শিক্ষা কর্মসূচি

শেখ শফিকুর রহমান

শিক্ষা কার্যক্রমে কোভিড-১৯ এর প্রভাব :

স্বাভাবিক সময়ে শিক্ষা পরিস্থিতি ব্যাহত হবার জন্য যেসব বিষয় ভূমিকা রাখে মহমোরির সময়ে জোরালো হয়। করোনা ভাইরাসের প্রভাবে পৃথিবী জুড়ে বিদ্যমান স্থবিরতা থেকে শিক্ষাব্যবস্থাও রেহাই পায়নি। বংলাদেশ ইসিডি নেটওয়ার্ক (যেখানে ডাম নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য) একটি অনলাইন সমীক্ষার মাধ্যমে করোনার মহমোরি প্রাথমিক শিক্ষা বিকাশে বাধাগ্রস্তকারী এমন অনেক উদ্বেগ চিহ্নিত করেছে। কমিউনিটি ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে করোনার বিস্তৃতির কারণে শিশুরা এবং গৃহীত পরিবারের সদস্যরা মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে। ভাইরাসের বিস্তার রোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কারণে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও মানসিক জীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। সংক্রমিতদের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী ও স্থানীয় কমিউনিটি বিরূপ আচরণ ও অসহযোগিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। লকডাউন ও সামাজিক দূরত্বের ব্যবস্থার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর দরিদ্র পরিবার আয় শূন্য পর্যায়ে নেমে এসেছে। দৈনিক আয় হ্রাস শিক্ষার্থীর খাদ্য সুরক্ষা অনিশ্চিত হয়েছে। অনেক শিক্ষকের বেতন/আয় বন্ধ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। বয়স্কদের দ্বারা মানসিক টেনশন, ভয় এবং অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত যত্ন ও তদারকিতে ব্যবধান বা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে। এছাড়া, করোনা ভাইরাসের প্রকোপে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারের দুটি অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম থাকার পরেও ৮০ শতাংশ পড়াশোনা হ্রাস পেয়েছে। (তথ্যসূত্র: বিআইজিডি গবেষণা)।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখতে ডাম শিক্ষা সেক্টরের পদক্ষেপ

কঠোরভাবে লকডাউন পরিস্থিতি এবং দেশজুড়ে 'সামাজিক দূরত্ব' বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তার কারণে শিক্ষা পরিকল্পনাকারীরা চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ এবং আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় কোনো ঔষধ আবিষ্কার না হওয়ায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য ডাম শিক্ষা সেক্টর কাজ করেছে। বৈশ্বিক মহমোরি করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে সারা দেশে শ্রেণিভিত্তিক আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ রয়েছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আওতাভুক্ত শিক্ষা কার্যক্রমের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত, স্কুল–বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থী বেশি হওয়ায় পাঠ-কার্যক্রমে সংযুক্ত রাখা জরুরি। প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সংশ্লিষ্ট করণের সম্ভাব্য উপায়/কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে। ডাম শিক্ষা সেক্টর আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় নানা পদ্ধতি অবলম্বন পূর্বক শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ডামের মাঠ পর্যায়ের শিক্ষাব্রতীগণ শিক্ষার ধারাবাহিকতা চলমান রাখতে শিক্ষার বিকল্প পদ্ধতিগুলোর নতুনত্ব প্রদান ও তা প্রয়োগ করেছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে আইইসি ও বিসিসি উপকরণ উন্নয়ন : শিক্ষা সেক্টর কোভিড-১৯ প্রতিরোধে ইনফরমেশন, এডুকেশন, বিহ্যাভিয়রিয়াল চেইঞ্জ কমিউনিকেশন বিষয়ক অডিও-ভিডিও কন্টেন্ট এবং প্রিন্ট ম্যাটেরিয়াল তৈরি করেছে। ভিডিও কন্টেন্টের মধ্যে রিস্ক কমিউনিকেশন, রিস্ক মিটিগেশন, সামাজিক দূরত্ব

বজায়ের প্রয়োজনীয়তা, ভাইরাস থেকে প্রতিরোধের পূর্বক উপায়, কোভিড-১৯ এ ইমারজেন্সি রেসপন্স ইত্যাদি সোস্যাল মিডিয়া, ওয়েবসাইটসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির অব্যাহত রেখেছে।

ক্যাপশন-১ : শিক্ষা সেক্টরের বিসিসি কনটেন্ট

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা : চলতি বছরের মার্চ মাসের মাঝামাঝি দেশে করোনার ভাইরাস সনাক্তকরণের কারণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিভিত্তিক কার্যক্রম বন্ধ হয়। সরকারি নির্দেশনায় দেশব্যাপী লকডাউন, সামাজিক দূরত্বের প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজনীয় চলাচলে সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি নানা কারণে প্রযুক্তিভিত্তিক ভার্চুয়াল শিক্ষা সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। বিকল্পগুলোর কয়েকটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। যার মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানো, নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষকদের প্রস্তুতি, ডিজিটাল ডিভাইসের সীমাবদ্ধতা বা অনেকের অ্যাক্সে না থাকা, কমিউনিটি পর্যায়ে দুর্বল ইন্টারনেট সংযোগ ইত্যাদি। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে উপানুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে এই প্রতিবন্ধকতা অধিক প্রকট ছিল। এজন্য ডাম শিক্ষা সেক্টর প্রথমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের প্রস্তুত করে।

ডামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রকল্পে সুবিধাবঞ্চিত ও বিদ্যালয়–বর্হিভূত শিক্ষার্থীদের এই কোভিড-১৯ সময়ে শিক্ষা-ক্ষতি পূরণে প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পগুলি থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্বে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ পরিচালনা করা হয় । এই জরিপে মূলত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোনে অভিগম্যতা (অ্যাক্সে -স্বতন্ত্র বা হোম বেসড), ফোনের ধরন (স্মার্ট ফোন বা ফিচার ফোন), ইন্টারনেট সংযোগে অ্যাক্সেস, মোবাইল ডাটা পরিসেবাগুলির উপলভ্যতা ইত্যাদির উপর মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্য সংগ্রহের সময় শিক্ষা প্রকল্পের কর্মীগণ শিক্ষিকাদের বিশেষ ব্যবস্থায় শ্রেণি কার্যক্রমে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষা কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের দুর্যোগ সময়ের বিশেষ পাঠদান সম্পর্কে অবহিত করণ ও সহযোগিতা চাওয়া হয়। সংগৃহীত তথ্যসূমহ প্রচলিত পদ্ধতি বহির্ভূত করোনা ভাইরাসের এই দুর্যোগে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সংশ্লিষ্ট করণে সম্ভাব্য শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি/উপায় নির্ধারণে সহায়তা করেছে

ক্যাপশন-২: মোবাইল ফোনে পাঠ গ্রহণ করছে শিশু শিক্ষার্থীরা

মোবাইল ফোনে ভয়েস কলের মাধ্যমে শেখার নির্দেশনা : একটি সিএলসিতে গড়ে ৩০ জন শিক্ষার্থী আছে। সকল শিক্ষার্থীকে একদিন অন্তর মোবাইলে সংযুক্ত পূর্বক পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এভাবে কেন্দ্রের ১৫ জন শিক্ষার্থী সপ্তাহের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম দিনে ও বাকি ১৫ জন শিক্ষার্থী সপ্তাহের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ দিনে মোবাইল ফোনে নির্দেশনার মাধ্যমে ক্লাস করছে। শিক্ষক মোবাইল ফোনে গ্রুপ কলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দৈনিক পাঠে সংযুক্ত করেছেন। শিশু ও তার অভিভাবকের সাথে আলোচনা পূর্বক শেখার সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ-কলে গড়ে ১০ মিনিট করে মোবাইল ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে। একদল শিক্ষার্থীর সাথে ক্লাস শেষ করে শিক্ষক ৫/৭ মিনিটের একটি বিরতি নিয়ে আরেকদল শিক্ষার্থীদের সাথে ক্লাস নিচ্ছেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী-দলের শিখন অবস্থা ভিত্তিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকা ক্লাসের ১০ মিনিটের মধ্যে প্রথম ১/২ মিনিট কুশলাদি বিনিময়পূর্বক শিক্ষার্থী-দলের শারিরীক ও মানসিক পরিস্থিতি, তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য, হাত ধোয়ার চর্চা ইত্যাদির খবর নেবেন ।

শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় ও গুরুত্ব, ভীত না হওয়া, ইতিবাচক চিন্তা ও কাজ করা, নিজে ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য যেমন, ছোট ভাই-বোনকে রক্ষা, সুরক্ষিত রাখার উপায় ও গুরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষকরা আলোচনা করেন। একদিনে সব বিষয় নিয়ে আলোচনার পরিবর্তে শিক্ষক/শিক্ষিকা ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপরে পাঠ্যসূচি ও দৈনিক রুটিন অনুসারে শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে। ডাম শিক্ষা সেক্টরের সব প্রকল্প এই পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক (প্রায় ৬০ শতাংশ -৬৫শতাংশ) শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নের সাথে সংযুক্ত করেছে।

মোবাইল ফোনভিত্তিক ভিডিও কন্টেন্টের মাধ্যমে শিখন কার্যক্রম : যে সকল শিক্ষার্থীর বাড়িতে স্মার্ট ফোনে অ্যাক্সে আছে, তাদের এই মাহামারিতে বিষয়ভিত্তিক পাঠের ভিডিও কন্টেন্টের প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিষয়ভিত্তিক ভিডিও কন্টেন্টের মাধ্যমে পাঠ কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। একদিন বিরতিতে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীগণ শিক্ষার্থীর সাথে শিখন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভিডিও কন্টেন্টের কিছু অংশ শিক্ষকরা এবং কিছু ইউটিউব থেকে ওপেন এডুকেশন রিসোর্স হিসেবে সংগ্রহ করা হয়েছে। ভিডিও কন্টেন্ট ভিত্তিক পাঠ-অগ্রগতি শিক্ষা-কর্মী ও শিক্ষকগণ প্রতিদিন সুপারভিশনে রাখছেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রকল্পগুলো ৫-৮ শতাংশ শিক্ষার্থীকে শিক্ষার আওতাভুক্ত।

সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যসচেতন থেকে বাড়িভিত্তিক পাঠদান : পাহাড়ি এলাকা, হাওড় ও উপকূলীয় এলাকায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যেসকল শিক্ষার্থীকে পাঠ কার্যক্রমে সংযোগ করা সম্ভব হয়নি তাদের পাঠ্য কার্যক্রমের আওতায় বাড়িভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশে যখন প্রয়োজনমতো স্কুল ছিল না তখন পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ ছাত্রদের বাড়িতে গিয়ে পাঠদান করতেন, তাই বিষয়টি মোটেও নতুন নয়। একটি স্কুল বা সিএলসির যে সকল শিক্ষার্থীও শিক্ষকের হেঁটে যাওয়া যায় এমন দূরত্বে অবস্থান করে এবং যাদের মোবাইল ফোনে অ্যাক্সে নেই, শিক্ষক/শিক্ষিকা সেই সকল শিক্ষার্থীদের বাড়িতে যেয়ে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্য সচেতন থেকে পাঠ-কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ডামের বিভিন্ন শিক্ষা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার ৯-১১ শতাংশ শিক্ষার্থী এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সহায়তা পাচ্ছে।

পাঠ পরিকল্পনা ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ : দৈনিক পাঠ-সহায়তার ক্ষেত্রে প্রতিদিন রুটিন করে ৩/৪টি প্রধান বিষয়ের কার্যক্রম থাকে। শিক্ষার্থীর সাথে ইন্টারঅ্যাকশনের খুব বেশি সুযোগ না থাকায় শুধু গুরুত্বপূর্ণ পাঠগুলো বিবেচনায় রাখা হয়। পাঠদানকারী শিক্ষক ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীকে বাড়ির কাজ দেন। শিক্ষার্থীরা পৃথক বিষয়ভিত্তিক খাতায় তারিখ অনুযায়ী বাড়ির কাজ করে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর পড়া বা পাঠ বিবেচনায় সাপ্তাহিক মূল্যায়নও করে। শিক্ষার্থী তার বাড়ির খাতায় মূল্যায়ন/পরীক্ষা দেয়। ইন্টারনেট সুবিধার আওতায়ধীন থাকা শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন খাতার ছবি তুলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করে। বাকি শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার খাতা বাড়িতে জমা রাখে। শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মীবৃন্দ একটি নির্দিষ্ট সময়ান্তে শিক্ষার্থীর খাতা মূল্যায়ন করে। সকল তথ্য শিক্ষক একটি রেজিস্টার খাতায় ডকুমেন্টেশন করেন। বাড়ির কাজে প্রাপ্ত নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। যা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীর নতুন শ্রেণি বা গ্রেডে উত্তীর্ণ হবার ক্ষেত্রে দলিল হিসেবে কাজ করবে।

এছাড়া, শিক্ষার্থীদের এই কোভিড-১৯ সময়ে বাড়ির সহোদরের মাধ্যমে 'ওয়ান টু ওয়ান পাঠদান', শিশুদের বাবা-মায়েদের 'হোম টিচিং' পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিটিভি ও সংসদ টিভির ক্লাস রুটিন সংগ্রহ পূর্বক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রদান করে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের টেলিভিশনে অনুষ্ঠিতব্য প্রয়াস রয়েছে। ক্লাসের সাথে শিক্ষার্থীদের সংযুক্ত করা হয়েছে। সকল শিক্ষার্থীকে তার উপযোগী নানা বিকল্প পদ্ধতিগুলো ডামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রকল্পগুলি প্রয়োগ পূর্বক শিক্ষার্থীদের পাঠকার্যক্রমে যুক্ত করণের প্রয়াস রয়েছে।

জুম অ্যাপস, গুগল ক্লাসরুম বা মেসেঞ্জারভিত্তিক লাইভ শ্রেণি কার্যক্রম : ইন্টারনেট সুবিধাসহ কম্পিউটার বা স্মার্টফোনধারী শিক্ষার্থীকে এই কোভিড-১৯ মহমোরিতে আইসিটি নির্ভর অনলাইন লাইভ ক্লাস পরিচালনার মাধ্যমে পাঠদানে সংযুক্ত রাখা হয়েছে। ফেইসবুক লাইভ, মেসেঞ্জার রুম, জুম অ্যাপস, হোয়াটস্অ্যাপ, ও গুগল ক্লাসরুমের মতো সহজ ও জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যবহার পূর্বক ডামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, এআইআইসিটি ও আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশবিদ্যালয়) ও আরবানের শিক্ষা প্রকল্পগুলো শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্লাসগুলি অনলাইনে সঞ্চিত থাকে। তাই কোনো শিক্ষার্থী যেকোনো লাইভ ক্লাসে বিশেষ কারণে অনুপস্থিত থাকলেও সুবিধামতো সময়ে ক্লাসের ভিডিওগুলি দেখতে পারে। আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, এআইটিভিইটি, এআইআইসিটি, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শ্রেণি কার্যক্রম এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একটি সংক্ষিপ্ত জরিপের ভিত্তিতে, পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় আরবানের শিক্ষা প্রকল্প হতে ৪৫-৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ৬৫-৭০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিতভাবে লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করছে।

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা : ডাম শিক্ষা সেক্টর প্রযুক্তিভিত্তিক ভার্চুয়্যাল পদ্ধতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অনুশীলন, প্রচার এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা অর্জন ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে । বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আগত শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের বৈচিত্র বেশ স্পষ্ট। আহ্ছানিয়া মিশন কলেজ, ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট, এআইআইসিটি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীদের তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স, সচেতনতা এবং ডিজিটাল ডিভাইসে প্রবেশাধিকার অধিক থাকায় শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণের হার

বেশি। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, প্রযুক্তিতে অভিগম্যতা এবং শহরকেন্দ্রিক অবস্থান হওয়ায় ভার্চুয়্যল শ্রেণি কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণ ভালো। অন্যদিকে, মাঠ পর্যায়ে বৈদ্যুতিক লোডশেডিং, পিতামাতার অসচেতনতা, প্রযুক্তি ব্যবহারে কিছুটা ভয়, যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতির অভাব, ব্যবহারিক শ্রেণিকার্যক্রমের অনুপস্থিতি ইত্যাদি নানা কারণে বিকল্প পদ্ধতিতে কিছুটা বিঘ্ন বৃষ্টি করেছে।

ক্যাপশন-৩: শিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পরিবারের অন্যরা সদস্যদের ওয়াশ কার্যক্রম

শেখ শফিকুর রহমান
কোঅর্ডিনেটর, এমঅ্যান্ডই, এডুকেশন সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

একাল সেকাল মুক্তির শিক্ষায় করোনাকাল

এএইচএম নোমান

রূপকল্প ২০৪১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণসহ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম মানব সম্পদে পরিণত করতে সরকার বদ্ধপরিকর।... বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু-কিশোরদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আইন ২০১৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনে সাক্ষরতা কর্মসূচিকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। – রাষ্টপতি মো. আবদুল হামিদ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধানের ১৭(গ) অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের অঙ্গীকার করে। – প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করেছিলেন। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন, জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। – প্রতিমন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

বিদ্যালয়ে ভর্তি হার বৃদ্ধি, ঝরেপড়া রোধ, পুষ্টি চাহিদা পুরণ, প্রাথমিক শিক্ষা চক্র সমাপ্তি। মিড-ডে-মিল পরিচালনা, মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে উপবৃত্তির অর্থ বিতরণ, ভৌত ও অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা, মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দৃশ্যমান সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে।... সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মোঃ আকরাম আল-হোসেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রকাশিত ২০১৯ এর 'অঙ্গীকার' থেকে সংগৃহীত মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সম্মানিত সচিব মহোদয়ের দিকনির্দেশনা ও বক্তব্য যদি আমরা ধারণ ও বহন করি তাহলে আর কি লাগে? প্রয়োজন শুধু দেশপ্রেম ও মুক্তির ইতিহাসের পাতা থেকে গেরিলা কায়দায় ব্যবহারিক ও কার্যকর বাস্তবায়নে পথে চলা। করোনার শিক্ষা বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ কায়েম করা। এসডিজি ১ নং এজেন্ডা এন্ডিং পভার্টিকে উপরে তুলে আনলেই করোনা সংকট নিরসন কৌশল সহজ হবে। শিক্ষা প্রকৃতভাবেই গণশিক্ষা হবে। বৈষম্য সৃষ্টির শিক্ষা হবে না। করোনার শিক্ষা নীতি, পরিবর্তনই আজ সাক্ষরতা দিবস ২০২০-এর কাম্য। সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির শুরু থেকেই এনজিও 'ডরপ' রামগতিতে মাত্র ৪টি শিক্ষাকেন্দ্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ডরপ এখন পর্যন্ত সকল কর্মসূচিতে গর্বিত অংশীদার। ধন্যবাদ।

সেকাল : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সর্বপ্রথম উপকূলীয় রামগতি ১৯৭২ সালে ২০ ফেব্রুয়ারি আগমন উপলক্ষ্যে গণশিক্ষা আন্দোলনের ক-খ-গ, ১-২-৩ লিখা নিয়ে আমিসহ রামগতির শত শত মুক্তিযোদ্ধা, সমবায়ী-যুবক গ্রামোন্নয়নে সড়ক নির্মাণে স্বেচ্চাশ্রম কাজে অংশগ্রহণ করি। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের ঘোষণায় রামগতিতেই ১২০টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যে বিশ্বগ্রামসহ ১২টি কেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রুপান্তর হয়। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে কেন্দ্র করে এই আগমনস্থল রামগতি থেকেই দেশে প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন উপলক্ষ্যে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক মুক্তিযোদ্ধা, যুবক, দেশপ্রেমিক, স্বচ্ছল ব্যক্তি, গোষ্ঠী এ ডাকে যোগ দেন। নবগঠিত বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে বেতার সৈনিক মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ আবুল কাশেম সন্দ্বীপ-এর সমন্বয়ে সারা দেশে এ আন্দোলন ছড়িয়ে যায়। বৃহত্তর দিনাজপুরের বিরল থানার কচুবাড়ি কৃষ্টপুর দেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম। কুমিল্লা একাডেমির গণশিক্ষা বিশেষজ্ঞ আবদুল কুদ্দুস, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফেরদৌস খাঁন-এর 'বড়দের বই' বাজারের 'আদর্শ লিপি' ছাড়াও 'চেতনা' ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ছাপিয়ে সরবরাহ করা হয়। ব্র্যাক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনাব ফজলে হাসান আবেদ সুনামগঞ্জের দিরাই-সাল্লায় এবং সরকারের সচিব সিএসপি ড. এম এ সাত্তারের সহধর্মিণী মিসেস এলেন বাংলাদেশ গণশিক্ষা সমিতি BACE প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাঁদপুরের শাহরাস্তির মেহেরপঞ্চ গ্রামে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেন। উভয় উদ্যোগই বিদেশী আর্থিক সাহায্যে। অপরদিকে দেশজ পদ্ধতিতে স্থানীয় উদ্যোগ-সম্পদে শার্শা ঝিকরগাছায় মাটি-কাঠি ও মুক্তাঙ্গন পদ্ধতি, রাঙ্গুনিয়া, গাইবান্ধার সাদুল্ল্যাপুর, কিশোরগঞ্জের লতিফাবাদ, কাঁঠালিয়া, বেতাগী, মাগুরার শ্রীপুর, রামগতি, রৌমারী, পাঁচবিবি এমন শত শত এলাকায় স্থানীয় উদ্যোগে গণশিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর থেকে এ কার্যক্রমে রাজনৈতিক, সামাজিক, তথা রাষ্ট্রের গণমুখী ও গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত না থাকায় তা প্রথমে মুখ থুবড়ে পড়ে ও পরে থেমেই যায়। এর ফলে স্বদেশী, স্ব-সম্পদে দেশপ্রেমিকতার উপলব্ধিতা ও মুক্তিযুদ্ধের ন্যায্যতা ও সাম্যতার ডাক তথা শিক্ষার সাংবিধানিক ১৭(গ)-এর বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা দিন দিন বৈষম্যের শিকার হতে থাকে।

করোনায় বিত্তহীনদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। কারণ তারা রোদে মাঠে ঘাটে প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে জীবনযুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা বিভিন্ন সময় ছোট খাট অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হয়ে স্বাভাবিকভাবেই ভাল হয়ে যায়। এতেও তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেকটা বাড়ে। তাই কম্যুটিস্ট করোনাভাইরাসের করুণার দৃষ্টিতে তাদের অবস্থান। এঁরাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে মূল লক্ষ্যজনগোষ্ঠী। অপরপক্ষে বিত্তবানদের অবস্থা মুখে মাস্ক ব্যবহার– স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা, ঘরে থাকা, আশংকা ভয়ভীতি, আক্রান্ত ইত্যাদি।

কোভিড-১৯ সংকটে সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা হতে হবে গতানুগতিক চিন্তাচেতনা ও পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার অনুকরণে চাপান অনুশীলনের প্রাধান্য না দেয়া। দেশজ পরিবেশ পরিস্থিতিতে আর্থ-সামাজিক গ্রামীণ কালচারকে প্রাধান্য দিয়ে করোনাভাইরাস-এর ঐশ্বরিক দিকনির্দেশনাকে মেনে বিত্তহীন-বান্ধব জীবন ব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। দেশজ গণশিক্ষাবিদরা বলছেন, শতভাগ শিক্ষা আন্দোলনে '২য় সুযোগ' প্রকল্পই দিচ্ছে 'শেষ সুযোগ'। কোভিড-১৯-এর শিক্ষা যাতে আর কোন অক্সফোর্ড-ক্যামব্রিজ চিন্তাপ্রসূত শ্রেণি চরিত্রের প্রকল্প দরকার নাই। রাজনৈতিক অঙ্গীকারই যথেষ্ট। করোনার বাধ্য করা 'অভ্যাস পরিবর্তন' অনুশীলনের সাথে সর্বজনীন শিক্ষা বাস্তবায়ন 'চরিত্র বদলানই' হবে আমাদের মুক্তির শিক্ষা। তাই কাজ হবে শোষিত-বঞ্চিত তথা গরিবদের সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা জাল আওতায়

স্বল্প-মধ্য মেয়াদের প্রকল্পের পাশাপাশি মা'কে কেন্দ্র করে অর্থ-উপকরণ-সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে শিরোনামে নিয়ে আসা। শুদ্ধির মাধ্যমে মাটি-মানুষ ও মালিকানা দেবার দুর্নীতির উর্ধে থেকে সুনীতির শিক্ষার ভিত কায়েম করা।

একাল : দেশে দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা চালু হয়েছে। ভাতাপ্রাপ্ত মা-শিশুকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যৎ নিরক্ষরমুক্ত পরিকল্পিত জনসম্পদের বাংলাদেশ রচনা করতে হবে। এই উন্নয়ন বটম লাইনিং মা-শিশুকে 'শিক্ষা ও বিনোদন কার্ড' রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রদান করতে হবে। যা শিশুর ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবন সুরক্ষিত করবে। মাতৃত্বকালীন ভাতাকেন্দ্রিক মৌলিক চাহিদা সম্বলিত 'স্বাস্থ্য কার্ড, শিক্ষা কার্ড, আবাসন, জীবিকায়ন-কর্মসংস্থান স্বপ্ন প্যাকেজ' কার্যক্রমের আওতায় 'শিক্ষা কার্ড' একটি অংশ। শর্তযুক্ত স্বপ্ন প্যাকেজের প্রত্যেক মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত মা ঊর্ধ্বে ২ শিশুর জন্য ৪-৫ বছর বয়স থেকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রদেয় শিক্ষা কার্ডের আওতায় অন্তত অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত জীবনভিত্তিক আনুষ্ঠানিক/ব্যবহারিক শিক্ষা নিশ্চিত হবে। এরপর শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্তে যে যার স্বাধীন সিদ্ধান্তে চাকরি বা শ্রমবাজারে যাবে। এ শিক্ষা কার্ড উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা মাদ্রাসার কাঠামোর সাথে যুক্ত হবে। সরকারিভাবে পাইলট এই 'স্বপ্ন প্যাকেজ' মডেলটি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর জাতির পিতার জন্মস্থান টুঙ্গিপাড়া, বাংলাদেশের জন্মস্থান মুজিবনগরসহ দেশের ১০টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করে। স্মৃতিতে ভাসে যে, মুক্তিযুদ্ধকালে নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অনুশীলন জন্মস্থান রৌমারী। তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম পাপু ভাইয়ের নেতৃত্বে কুমিল্লার অধ্যাপক শ্রী বিমল বাবুর অনুশীলনে চালু হয়। সে সময় অনেক দেশী-বিদেশীর এই কর্মকাণ্ড পরির্দশনে মুক্তিপাগলদের প্রেরণা জাগ্রত হয়। ঐতিহাসিক এ অনুশীলন জন্মস্থানে আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রতিমন্ত্রী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মোঃ জাকির হোসেন, এমপি'র জন্মস্থান। এটা গর্বের বিষয়। আমি নিজেও মুক্তিযুদ্ধোত্তর নদী পার হয়ে দুর্গম রৌমারীতে পাপু ভাই ও মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার শামসুল হকের আতিথিয়েতায় প্রথম নিরক্ষর মুক্ত আন্দোলনের জন্মস্থান দেখতে যাই। সেই সেকাল, একাল এবং করোনাকাল অনেক প্রশ্ন–অনেক উত্তর আজকের মুক্তির শিক্ষায় বহমান। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মোঃ জাকির হোসেন হলেন নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার মালাকার।

শিক্ষা কার্ডে স্থানীয় সরকার উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও ইউনিয়ন শিক্ষা স্ট্যান্ডিং কমিটির সভাপতি স্বাক্ষর প্রদান করেন। কার্ড পেয়ে প্রতিটি মা-বাবা শিক্ষার উপর সরকার প্রদত্ত মালিকানা খুঁজে পায়। সরকার থেকে শিক্ষা কার্ড প্রদানের কারণে স্কুলে যায় না, গেলেও ঝরেপড়ে, শিখন কেন্দ্র ইত্যাদি আর লাগবেনা। নিশ্চিত হবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রমে উপস্থিতি শত ভাগ টার্গেট পূরণ। মাতৃত্বকালীন ভাতাপ্রাপ্ত মা-বাবা সন্তানদের এই 'শিক্ষা কার্ড' আওতায় এনে আগামী ২০ বছর এক প্রজন্ম মেয়াদে ১ কোটি মাকে টার্গেট করে সকল শিশুকেই শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব। স্বপ্ন প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যেমনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব, তেমনি নিরক্ষরমুক্তির জন্য শিশুদের 'শিক্ষা ও বিনোদন কার্ড' প্রবর্তন করে নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

করোনা সংকটে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কাজ করছে। সৃষ্টিকর্তা করোনা দুর্যোগ মোকাবেলায় শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এগিয়ে দিচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত উন্নয়ন তলরেখা আল্লাহ প্রদত্ত বটম লাইনিং মা'কে কেন্দ্র করে মাতৃত্বকালীন ভাতাকেন্দ্রীক শিশুদের এই অনানুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় কার্যকরভাবে না আনা হবে ততদিন পর্যন্ত নিরক্ষর মুক্ত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব নয়। 'স্বপ্ন মা রানী'

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মাতৃত্বকালীন ভাতা ৩ বছর মেয়াদের স্থলে ৫ বছর করার বিনীত আবেদন জানাচ্ছি। যাতে একই সঙ্গে জন্ম নিবন্ধন-তথ্য ভাণ্ডারে শিশুরা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় আনুষ্ঠানিক পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তাহলেই গুণগতমানসহ বৈষম্যহীন শিক্ষার ভিত টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা নং ৪ এর লক্ষ্য বাস্তবায়ন হবে। তাহলেই বাংলাদেশ 'নিরক্ষরমুক্ত', মালা পরতে পারবে।

এএইচএম নোমান
প্রতিষ্ঠাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা ও স্বপ্ন প্যাকেজ প্রবর্তনকারী সংগঠন–ডর্প
মোবাইল : ১৭১১৫২০৩৫১
ই-মেইল-nouman@dorpbd.org

কাভিড ১৯ : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল প্রণয়নে ইউসেপ বাংলাদেশ

কুমার প্রীতীশ বল

১. কখনও কখনও সত্যও কল্পনাকে ছাড়িয়ে গিয়ে অবিশ্বাস্য ঠেকে। তা নাহলে এই পৃথিবীতে কি কেউ ভাবতে পেরেছে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরে আমেরিকা ঘরে বসে অসহায়ভাবে এতো সংখ্যক নাগরিকের মৃত্যু দেখবে? কিন্তু কোভিড ১৯ নামের মহামারীর কারণে আজ অবাক পৃথিবী অবাক তাকিয়ে রয়। এখন পুরো দুনিয়া কোভিড ১৯ আক্রান্ত, এটি কখন থামবে, কোথায় নিয়ে যাবে কেউ জানে না। কোভিড-১৯-এর প্রাদুর্ভাব বিশ্বজুড়ে নিয়ে এসেছে এক মহাস্থবিরতা। ব্যর্থ করে দিয়েছে জীবনের প্রতিটি হিসাব-নিকাশ। পৃথিবী এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি আগে কখনও হয়নি, যেখানে জীবন এবং জীবিকা উভয় ঝুঁকিতে রয়েছে। বাংলাদেশে প্রথম কোভিড ১৯ সনাক্ত হয় ৮ মার্চ। এদিন ঘোষণা করা হয়, দেশে প্রাণঘাতী এই ভাইরাসে আক্রান্ত তিন রোগী শনাক্ত হয়েছে। তারপর দিন দিন বেড়ে চলেছে। সে সঙ্গে যুক্ত হয় মৃত্যু। ফলে সরকার ১৭ মার্চ থেকে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেন। সাধারণ ছুটিও ঘোষণা করেন। আগামী ৩ অক্টোবর পর্যন্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

২. এমন পরিস্থিতিতে এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হচ্ছে। এবারে দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়- 'কোভিড ১৯ : সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা' সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ চলমান সংকট এবং পরবর্তী নতুন পরিস্থিতিতে নিশ্চিতভাবে বৈশ্বিক চাহিদা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন চীন, জাপান নতুন শিল্প উদ্যোগের কথা ভাবছে। কোরিয়া ইতিমধ্যে বিনিয়োগের জন্য নতুন গন্তব্য অনুসন্ধান করছে। এখন পর্যন্ত বুঝা যাচ্ছে, করোনা পরবর্তী নতুন পরিস্থিতিতে বৈশ্বিক চাহিদা আগের মতো হবে না, শিল্প-কারখানায় নতুন নতুন উদ্ভাবনী সংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হচ্ছে, ভবিষ্যতের চাকরির সুযোগটি স্বাস্থ্য, কেয়ার গিভিং, আইটি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, অ্যাকাউন্টিং এবং বড় বড় ডেটা ব্যবস্থাপনা, ইন্টারনেটভিত্তিক সামগ্রী (আইওটি) ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করবে। তাই কর্মমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তন করতে হবে। আর এই পরিবর্তনের জন্য শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা নিয়ে কাজ করে এমন সব প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদেরও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। আমি নিশ্চিত, বাংলাদেশ উল্লেখিত পরিস্থিতিতে সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশলে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ থেমে নেই। নানানভাবে সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই চেষ্টা সরকারি, বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ে চলছে। আবার সরকারি ও বেসরকারি যৌথভাবেও চলছে। এখানে ইউসেপ বাংলাদেশ-এর অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তনের সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি যৌথ উদ্যোগ সম্পর্কেও জানা যাবে।

৩. সরকারের নির্দেশে দেশের সব প্রতিষ্ঠানের মতো ইউসেপ বাংলাদেশ পরিচালিত ৩২টি সাধারণ বিদ্যালয়, ১০টি কারিগরি বিদ্যালয়, ১৭টি কারিগরি আউটরিচ সেন্টার ও ২টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট বন্ধ ঘোষণা করে। ইউসেপ বাংলাদেশ কারিগরি বিদ্যালয় ও কারিগরি আউটরিচ সেন্টারসমূহে ৩৭টি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থানের উপযোগী করে তৈরি করতে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিমূলক সফট স্কিল প্রশিক্ষণও প্রদান করে, যা বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ অর্জনকে তরান্বিত করতে সহায়তা করছে।

কোভিড ১৯ সারাদেশের মতো এ সংস্থার শিক্ষার্থীদেরও বিরাট ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির মুখোমুখি করে। জীবন বিপন্ন হওয়ার সামিল হয়ে পড়ে এখানকার সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের পরিবা-রসহ কয়েক লক্ষ জনগোষ্ঠীর, যারা কিনা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। ইউসেপ বাংলাদেশ কোভিড ১৯-এর প্রত্যাশিত ঝুঁকি এবং এই মহামারীর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস করতে তাৎক্ষণিকভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

প্রথম পদক্ষেপ ছিল, মানবিক সহায়তা (খাদ্য এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র) প্রদান। দরিদ্রতম পরিবারগুলোর শিক্ষার্থীদের ইউসেপ বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দাতাসংস্থা অস্ট্রেলিয়ান হাই কমিশনের Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)) এর 'COVID-19 Response for Vulnerable Children and Youth' প্রকল্পের অধীনে এবং নানাভাবে নগদ অর্থ ও সামগ্রি সংগ্রহ করে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে। এক্ষেত্রে দরিদ্রতম নারী শিক্ষার্থী, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং সুবিধাবঞ্চিত পরিবারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এদের বেশিরভাগের পিতামাতা দিন মজুর এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে; যাঁদের জীবন-জীবিকা কোভিড-১৯-এর কারণে স্থবির হয়ে পড়ে। এখন পর্যন্ত ইউসেপ বাংলাদেশ ১২ হাজারের বেশি পরিবারকে তাদের কষ্টের পরিমাণ বিবেচনা করে ত্রাণ বিতরণ করেছে।

ইউসেপ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে 'আয়মূলক দক্ষতা, শিখতে সহায়তা' লক্ষ্য নিয়ে দরিদ্র সুবিধাব-ঞ্চিত পরিবার থেকে আগত দারিদ্র্যের কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু এবং যুবাদের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব শিশুকে দ্বিতীয়বার শিক্ষার সুযোগ প্রদান করে এবং তরুণ যুবাদের কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করে শোভন চাকরি নিশ্চিত করে এবং ব্যবসা উন্নয়নে সহায়তা করে। ইউসেপ বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থীকে এসব সুযোগ এবং সহযোগিতা প্রদান করে, যার মধ্যে ৫০% নারী, ১০% প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ২% জাতিগত বা পেশাগত সংখ্যালঘু এবং প্রায় ৪০% শহুরে কর্মজীবী শিশু আছে। তাই দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে শিক্ষাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

৪. কোভিড ১৯-এর কারণে বিশ্বব্যাপী স্বাভাবিক শিক্ষা ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ এবং শিক্ষানবিশীসহ দক্ষতা বিকাশের ধারাবাহিকতা হুমকির মুখে। ইউনেস্কো-এর মতে, মে মাসের মধ্যেই বিশ্বের প্রায় তিন চতুর্থাংশ শিক্ষার্থী স্কুল বন্ধের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) পরিচালিত এক বৈশ্বিক জরিপের মাধ্যমে জানা যায়, ৮০% এরও বেশি শিক্ষানবিশী উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে, ৩% এর উপবৃত্তির প্রদান বন্ধ হয়ে গেছে। মহামারী শেষ হওয়ার পরেও এর প্রভাব থাকবে। ইতিমধ্যে প্রতি ছয়জন তরুণ-তরুণীর মধ্যে একজনের কাজ করা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে, বেকারত্বের হার বেড়ে যাবে। ইউনেস্কো, আইএলও এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথভাবে পরিচালিত জরিপের মাধ্যমে উঠে এসেছে, অনলাইনে দূর-প্রশিক্ষণ এক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন হতে পারে। যদিওবা পাঠ্যক্রমের অভিযোজন (Adaptation), প্রশিক্ষণার্থী ও প্রশিক্ষকের প্রস্তুতি, মূল্যায়ন এবং প্রশংসাপত্রে বিশেষ করে

উন্নয়নশীল দেশসমূহের কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ইউসেপ বাংলাদেশ এ পরিস্থিতিতে এখনই ডিজিটাল এডুকেশন পরিচালনার জন্য দূর শিখনের উদ্যোগ নিয়েছে। বিশেষত সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা এবং পড়াশোনার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে অনলাইন প্রশিক্ষণ সেশনের ব্যবস্থা করেছে। এটি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।

ইউসেপ বাংলাদেশ সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তনের উদ্যোগ হিসেবে প্রথমেই শিক্ষক এবং কর্মীদের দূর শিখন পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যাতে শিক্ষক এবং কর্মীরা ডিজিটাল পাঠ্যসূচি প্রস্তুত করতে পারে। একই সঙ্গে বিভিন্ন ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করে শিক্ষক নতুন পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং শেখানোর জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারে। এর সুফলও দ্রুত পাওয়া যায়। ইউসেপ বাংলাদেশ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ২৫০০ ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে ৩৫০ এর অধিক অনলাইন সেশন পরিচালনা করে। সাধারণ শিক্ষার জন্য দুই শতাধিক ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে। এসএসসি কারিগরি শিক্ষার্থীদের জন্য তিন শতাধিক অনলাইন সেশন পরিচালনা করে। এসব অনলাইন সেশনে উপকারভোগীদের প্রায় ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। একই সঙ্গে দূরশিখনের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আবার ওয়ার্কশপভিত্তিক মুখোমুখি শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা করে, যেখানে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা সম্ভব হয়। পাঠ্যক্রম হালনাগাদের মাধ্যমে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি কাজ হলেও এ সংস্থা প্রক্রিয়াটি শুরু করেছে। ছুটির সমন্বয় করে বৈকালিক কোর্স পরিচালনার পাশাপাশি শিক্ষাঘণ্টা পর্যালোচনা করছে। ছুটির দিনেও ক্লাস পরিচালনার কথা ভাবছে। এভাবেই বাংলাদেশের সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তন আনয়নের জন্য নানাবিধ যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইউসেপ বাংলাদেশ।

৫. সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তনের লক্ষ্যে শুধু ইউসেপ বাংলাদেশ নয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারও কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে শিক্ষামন্ত্রণা-লয় বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ডিজিটাল এডুকেশন পরিচালনার মাধ্যমে দূর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র পরিচালিত বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) ও সংসদ টিভি'র মাধ্যমে প্রি-প্রাইমারি থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস সম্প্রচার করেছে। ইউসেপ বাংলাদেশে'র শিক্ষার্থীরা এই সুযোগটিও পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে। তারা এই ক্লাসে অংশ নিচ্ছে। এজন্য শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে বিটিভি'র ক্লাস সংক্রান্ত নানান তথ্য সরবরাহ করছেন। যাদের টিভি দেখার সুযোগ আছে শিক্ষকরা তাদের উৎসাহিত করতে ক্লাস রুটিন এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করছেন। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নানান ধরনের নির্দেশনাও দিচ্ছেন। যাদের বিটিভি বা ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ নেই তাদের বাড়িতে থেকে অধ্যয়ন করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফলো-আপ এবং তাদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

ইউসেপ বাংলাদেশ সাক্ষরতা শিক্ষায় শিখন এবং শিখন কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে শুধু নিজেদের শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল এডুকেশন পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে তাই কিন্তু নয়; সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগও গ্রহণ করেছে। তাই ধ২র এবং ইউনিসেফ-এর যৌথ উদ্যোগে ইউসেপ বাংলাদেশ ডিজিটাল এডুকেশন বাস্তবায়ন করতে অনলাইন ক্লাস পরিচালনা করছে। এর ফলে সরকারি-বেসরকারি যৌথ অংশীদারিত্বের একটি অনন্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে মনো-সামাজিক পরামর্শ দেওয়া ইউসেপ বাংলাদেশ-এর আরও একটি বড় উদ্যোগ। প্রতিজন শিক্ষক এবং ১৫ জন শিক্ষার্থীর একটি গ্রুপের সঙ্গে একজন শিক্ষাদান কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে অনুসরণ এবং সাপ্তাহিক ভিত্তিতে মানসিক সহায়তা প্রদানের জন্য। এই উদ্যোগটিও বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করা সহজ হবে; সঙ্কটময় মুহূর্তে বাদ পড়ার আশঙ্কাও হ্রাস পাবে। এটি শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা চালিয়ে যেতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে।

৬. তারপরও এটাই শেষ কথা হলে চলবে না। এমন একটা পরিস্থিতিতে সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তন-শীল শিখন-শেখানো কৌশল এবং শিক্ষাবিদদের ভূমিকা রাখার জন্য সরকারের জরুরিভিত্তিতে সহযোগিতা করা দরকার। এক্ষেত্রে সরকারকেই নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। গুণমান প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাক্ষরতা শিক্ষায় পরিবর্তনশীল শিখন-শেখানোর জন্য পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত অবকাঠামো, কারিগরি প্রশিক্ষকদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং কাজের নতুন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করতে হবে।

কুমার প্রীতীশ বল
ম্যানেজার, কর্পোরেট এ্যাফেয়ার্স বিভাগ, ইউসেপ বাংলাদেশ

ফটো
গ্যালারি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার গ্রহণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উন্নয়ন মেলা ২০১৯, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর স্টল পরিদর্শন করেন জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ গোল টেবিল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে আগমন উপলক্ষে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এম.পি মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ গোল টেবিল আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আগমন উপলক্ষে সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ আকরাম-আল-হোসেন মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন এমপি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ এর বর্ণাঢ্য র‍্যালী

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৯ উপলক্ষে শিল্পকলা একাডেমীর মিলনায়তনে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সিনিয়র সচিব মহোদয় এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মহোদয়ের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ স্বাক্ষরিত হয় ।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ স্বাক্ষরিত।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মহোদয় এবং ঢাকা জেলার সহকারী পরিচালকের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১ স্বাক্ষরিত হয় ।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর অধীন পিইডিপি-৪ এর চলমান সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (পাইলট) কর্মসূচির মাঠ সমন্বয়ক, ট্রেইনার এবং সুপারভাইজারদের সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক মতবিনিময় সভা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (পাইলট) কর্মসূচির শিক্ষাকেন্দ্র

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর চলমান সেকেন্ড চান্স এডুকেশন (পাইলট) কর্মসূচির শিক্ষাকেন্দ্র

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সভাকক্ষে LCs ভেরিফিকেশন সংক্রান্ত স্থানীয় কর্মশালা

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'র ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্পর্কিত জিও- এনজিও সমন্বয় সভায় বক্তব্য রাখছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ ।

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা)'র ২য় পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা সম্পর্কিত জিও- এনজিও সমন্বয় সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ।

উদ্ভাবনী ও সেবা সহজিকরণ শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ ।

আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস-২০১৯ উপলক্ষে গোলটেবিল আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এমপি।

সেকেন্ড চান্স এডুকেশনে-এ প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তকরন বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকীতে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদত বার্ষিকীকে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারিবৃন্দ।

টেকনিক্যাল কো- অর্ডিনেশন মিটিং সাব- কম্পোনেন্ট ২.৫ আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রোগ্রাম, পিইডিপি ৪

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক শিশু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে

মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প (৬৪ জেলা) শিখনরত শিক্ষার্থীগণ

"সুবিধা বঞ্চিতদের জানালা" নামক বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক জনাব তপন কুমার ঘোষ।

সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থী জরিপ

সেবা সহজিকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ